বিপ্লবী SD
BIPLABI
সংবাদদর্পণ
শুভ নববর্ষ
১৪৩১
নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Website: www.vidyasagar.ac.in

VIDYASAGAR UNIVERSITY

Midnapore - 721102 WB INDIA

CENTRE FOR CONTINUING AND ADULT EDUCATION

director.ccae@vidyasagar.ac.in / dydirector.ccae@mail.vidyasagar.ac.in / ccaeoffice@mail.vidyasagar.ac.in

PG REGULAR 2023-24

ADMISSION OPEN

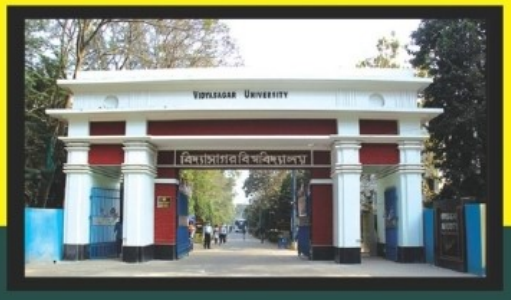

REGULAR EVENING PG COURSES OFFERED

- BENGALI
- ENGLISH
- HISTORY
- POLITICAL SCIENCE
- PHILOSOPHY
- SANSKRIT
- CHEMISTRY
- CLINICAL NUTRITION & DIETETICS
- ZOOLOGY
- GEOGRAPHY

Job Oriented Courses

Diploma

- SANTALI
- EPEDEMIOLOGY & PUBLIC HEALTH
- DATA SCIENCE
- COMPUTER APPLICATION AND PROGRAMMING

Certificate Course

- ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT
- ELECTRONICS AND E-WASTE MANAGEMENT
- BASIC COMPUTER APPLICATION AND INFORMATION SCIENCE
- ENGLISH FOR ALL
- JHUMUR
- AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ALL: ChatGPT
- COMPUTER MAINTENANCE AND NETWORKING
- COMPOSITE BIOFERTILIZER FOR SUSTAINABLE AGRICULTURE

For query: 8373861707 (10.30 AM - 5.30 PM)

Reg. No. WBBEN/1055/25/1/99-12/1998

P.Regd. No. WBSSP/MNP/RNP-33

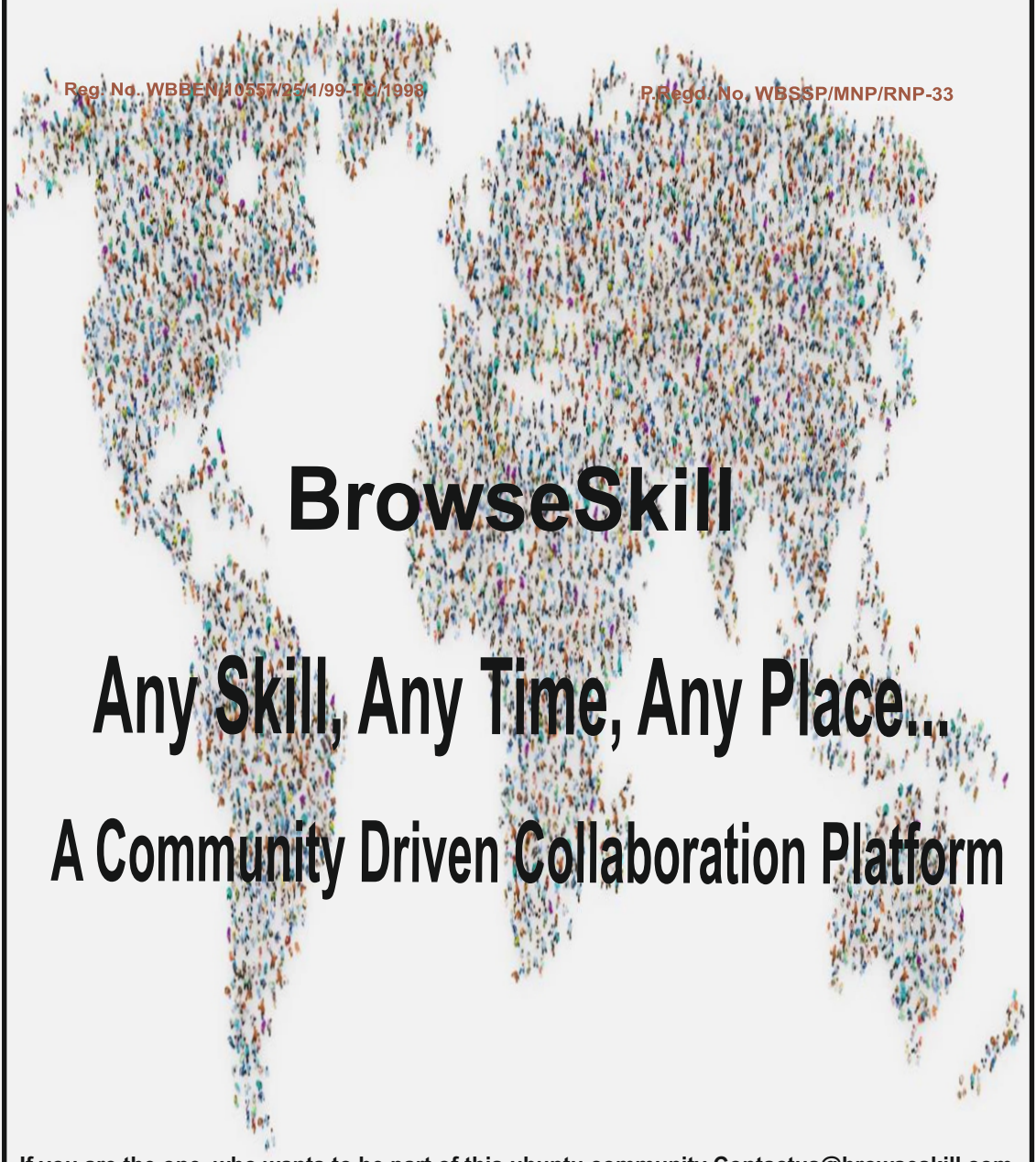

BrowseSkill

Any Skill, Any Time, Any Place...

A Community Driven Collaboration Platform

If you are the one, who wants to be part of this ubuntu community Contactus@browseskill.com

BrowseSkill Pvt. Ltd, Whitefield, Bangalore, India

With Best Compliments From : -

SANJOY MUKHERJEE MEMORIAL EDUCATION AND TRAINING INSTITUTE

(A Unit of Basundhara Janaklyan Trust)
Regd. No. 150500321 of 2020

ISO - 9001 : 2015

Courses Offered :-

Online Certificate Course
on

1. Feminism and Gender Studies
2. Human Rights and duties.
3. Mental Heath case of counselling
4. Yoga for Health living
5. Nutrition and Diet management.

Duration 2 Month

Course fee 500/- Examination - Google form
Eligible H.S. Admission going for 2024
Contact : 8373061254 ; 8436353391.
Payment mode : Gpay 8373061254

স্বনামধন্য স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ী
স্বর্গীয় বিজয় সাহার জ্যেষ্ঠ
পুত্র শ্রী বিশ্বজিৎ
সাহার পরিচালনায়
সাহা
অলঙ্কার আলয়
মোঃ ৯৮৩০০৩৬১৪৪৫
৭০৭৪৯৬২২৮৩
ঘোরানো সিঁড়ির দোতলায়
কোতবাজার , মেদিনীপুর শহর - ৭২১১০১

Hi
পেটুক ?
It's the craziest place
for every crazy
food lover.
Hi পেটুক
+91 85849 15689
At
Medinipur Town
Mohua Cinema, Bidhan Nagar, Paschim Medinipur-721 101
*T&C Apply
DM US FOR THE DIGITAL DISCOUNT COUPON

OFFICE OF THE E-mail : narmagrampanchayat@gmail.com

NARMA GRAM PANCHAYAT

Narayangarh Panchayat Samiti

P.O: Narma ● P.S : Narayangarh ● Dist. : Paschim Medinipur

"নানা ভাষা নানামত নানাপরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান"

জাতীয় সংহতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বাংলার ঐতিহ্যকে অক্ষুন্ন রাখতে ও উন্নয়নের শিখরে পৌছানোর লক্ষ্যে সকল স্তরের মানুষের কাছে নারমা গ্রাম পঞ্চায়েত আহ্বান জানায়।

শ্রী অজয় কুমার বেরা
উপ প্রধান
নারমা গ্রাম পঞ্চায়েত

শ্রীমতি শতরুপা মাইতি (নায়েক)
প্রধান
নারমা গ্রাম পঞ্চায়েত

জয় মা নাচিন্দা

অমৃতা জলযোগ ও রেস্টুরেন্ট

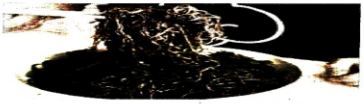

সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড ঃঃ মেদিনীপুর
মোবাইল ঃ ৬২৯৬৯৪৬৯৬৩ (সুভাষ) /
৮৩৭৩৮৯০৭৬৬, শশাঙ্ক ভদ্র (ছোটবাবু)

MAITY POULTRIES PVT. LTD.

LARGEST EGG PRODUCER IN WEST BENGAL.

www. maitypoultries.org

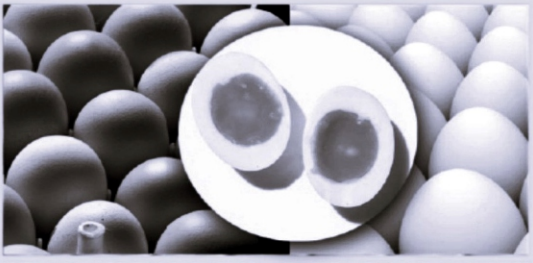

Eggs Available in 210 CT Pack.
Culled Birds in Wholesale,
Poultry Manure use for Pisciculture,
Agriculture, Tea Garden use for Cultivation
of Betelvine also used in Rose Sapling.

Egg Producer for Designer Egg
Ordinary Egg
Vita Plus
Sel Plex Egg
Carofil Egg
OVN Egg
In 6 Egg Pack

MAITY POULTRIES GROUP OF COMPANIES

Maity Poultries Pvt. Ltd. ★ Kumarpur Agro Poultries Ltd.
Sankrail Agro Poultries Pvt. Ltd. ★ Medinipur Agro Poultries Ltd.

Regd. Office :- Kumarpur, P. O. - Panchkhuri, Dist. - Paschim Medinipur

City Correspondence Office :
1/40, Rabindra Nagar, Paschim Medinipur, W.B. - 721101
Ph.:- 03222 274344, Fax- 03222 263970, Mob.- 9933333013, 9933333014
E-mail : maitypoultriesgr@gmail.com www. maitypoultries.org

For
Business Contact No. : 9933333015/16, 9933344754

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

গল্প / অনুগল্প

		পৃষ্ঠা
রাজ্যপালের বপু	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	১
আনন্দী	রতনতনু ঘাটী	৫
প্লাবন	শ্যামলী রক্ষিত	৯
এক ছিল রাজা	মহিবুল আলম	১৪
ঈর্ষা	অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়	১৭
মতিনের মা	নীলাঞ্জনা চক্রবর্তী	১৮
"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী"	দেবাশিস খাটুয়া	২১
এখন ভয় করে	নিমাই সিং	২৪
আদিবাসীদের শালুই বা বনপূজা	গোপাল দাস	২৬
যুদ্ধক্ষেত্র	ছবি প্রামাণিক	২৮
ঘুম	পশুপতি ভূঞ্যা	৩২
আশীর্বাদের ফসল	শংকর মাইতি	৩৪
ভারততীর্থ	রঞ্জিত মল্লিক	৩৬

প্রবন্ধ/ নিবন্ধ/ পৌরানিক কাহিনী

নাম না জানা হোরমিলার রেল	পল্লব মুখোপাধ্যায়	৩৮
সব শিক্ষাই মূল্যবান	ড. শুভেন্দু বিকাশ চক্রবর্ত্তী	৪১
যোগা-ক্লাশে যাওয়ার আগে সামান্য টিপস্	অচিন্ত মারিক	৪৪
উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ	দেবীপ্রসাদ ত্রিপাঠী	৪৬
তারাপীঠে নববর্ষ উদযাপন	প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২
"রানী শিরোমনির জন্ম স্থান বিতর্ক"	তপন কুমার সিংহ	৫৪
মোগলমারির বৌদ্ধবিহার	নির্মল ঘোড়াই	৫৫

কবিতা ঃ

৫৭-৭৭

আরণ্যক বসু ● শ্যামল চন্দ্র দে ● সৌমেন্দ্র নাথ মাহাত ●সুনীল মাজি ● ফেরদৌস সালাম ● অমিত বাগল ● ফাল্গুনী ঘোষ ● কানাইলাল জানা ● সুচরিতা চক্রবর্তী ● আসফ আল নূর ● রীতা বেরা পাল ● মৌমিতা মহাপাত্র ● শহিদ আজাদ ●রাখহরি পাল ● মদনমোহন দে ● শশাঙ্কশেখর অধিকারী ●এম মহিবুর রহমান ● সমীররঞ্জন খাঁড়া ● অপর্ণা দেওঘরিয়া ● নবজ্যোতি পাঠক ● রাজ কৃষ্ণ সামন্ত ● সৈয়দ হাসমত জালাল ● শান্তনু শর্মা ● দেবব্রত ভট্টাচার্য্য ড. বিনয় কুমার মজুমদার ● দিলীপ বসাক ● অয়ন কুমার সরকার ● রমাপ্রসাদ মুখাজী ● রাকা ভট্টাচার্য মানসজ্যোতি শর্মা ● শিবানী রায় ● Rhitwick Mukherjee ● Joydev Bera (Ramdhanu) ● বিকাশ চন্দ্র চন্ডী খাটুয়া ● শ্রী সৃষ্টিধর দে ● তাপস দেবনাথ ● ডি ড্যানিয়েল ● পুষ্প সাঁতরা

খেলাধূলা

ক্রিকেটের কিং ডন ব্রাডম্যান	বিধান চন্দ্র	৭৮

BIPLABI SAMBAD DARPAN

• প্রধান সম্পাদক •
৺মঙ্গলা প্রসাদ রায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রক
বিবেকানন্দ রায়
•অতিথি সম্পাদক•
রতনতনু ঘাটি, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল মাজি
• উপদেষ্টা মন্ডলী •
মহম্মদ আলি, সৃষ্টিধর দে, চন্দন কুমার বসু ও ডঃ প্রদীপ কুমার ভৌমিক, সজল মুখার্জী, আবির মল্লিক
• সহযোগী সম্পাদক •
নারায়ণ ভট্টাচার্য, ডঃ মনোরঞ্জন ভৌমিক ও প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধান চন্দ, পল্লব মুখোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ : দেব কুমার দত্ত (চিফ চিত্র সাংবাদিক)
• সহযোগিতা •
ডঃ দীপক কুমার দাসগুপ্ত, দীপেশ কুমার মণ্ডল, নিমাই সিং, অচিন্ত মারিক, সঞ্জয় মাহাত, সুনয়ম দে, জ্যোতি গ্রাফিক্স, দীপান্বিতা জানা ও সমপ্রকাশ মণ্ডল।
অলংকরণ : অসিত চক্রবর্তী
সার্কুলেশন ম্যানেজার : সুনীল চাবড়ী

KOLKATA OFFICE
"Shri Tower Buildings 101/, B.T. Road Bon Hooghly (3rd Floor), Kolkata- 700090, Phone: 033-2531-5367
HOWRAH OFFICE
Jasoda Bhaban', Ichapur, Sealdanga, P.O: Santragachi, Howrah-711 104, Call: 72315-73066, 78903-61645
BANGALORE OFFICE
411, 6, 'A' Main, 2nd Bloock, HRBR Layout, Kalyan Nagar, Bangalore-560 093, Cell: 09886170213, 081234-26994, 09945344266
OFFICE (Ph.)
KHARAGPUR : 9635221463/9732550839
HALDLA : 03224-286527
TAMLUK : 9933716645
ASANSOL OFFICE:
Hill View North, S.B. Gorai Rd. Asansol
Pin-713301 Cell: 9886170213
BISHNUPUR OFFICE
Sumangalam Lodge in Bishnupur
Bankura- 722122
Cell: 6294601149 /8900602055

MEDINIPUR OFFICE:
Debendra Bhavan -East Avenue 32, Bidhan Nagar, Midnapore, Dist Paschim Medinipur-721101, WB, Ph: (03222) 350569
Mob: 7586858573/7063174533/7699082386/8372999800/9647122603
E-ail: biplablsambadarpanmidnapore@gmail.com
news@biplabisambaddarpan.com
Website: www.biplabisambaddarpan.com

গান্ধী মিশন ট্রাস্ট চক্ষু হাসপাতাল

গান্ধী মিশন হাসপাতাল দীর্ঘ ৩৮ বছর মানুষের পরিষেবা করে চলেছে। এখানে বিভিন্ন ধরণের ফেকো ইত্যাদি চোখের অপারেশন করা হয়। বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের মাধ্যমে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। এখানে ORC করা হয়।

বিঃ দ্রঃ গরীব মানুষের বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশন করা হয়

দাসপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ১ কিমি ভেতরে পূর্বদিকে

নারায়ণ ভাই
সম্পাদক
গান্ধী মিশন

সম্পাদকীয়

পহেলা বৈশাখ

বাঙালির নববর্ষ একটি অন্যতম উৎসব। ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষ বাংলা ভূখন্ডের সব মানুষের প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। বৈশাখকে বরণ করতে গিয়ে রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন,

এসো, এসো এসো হে বৈশাখ।
তাপনিশ্বাসেবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দুর হয়ে যাক।।
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদুরে মিলাক।।
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

অতীতের গ্লানি-দুঃখ জরা মুছে ফেলে নতুন বছর সবার জন্য আনন্দ ও মঙ্গলের বার্তা নিয়ে আসবে এটাই প্রত্যাশিত। ধর্মীয় অনুষঙ্গহীন এরকম সর্বজনীন জাতীয় উৎসব পৃথিবীতে বিরল। বাংলা নববর্ষের সর্বজনীনতার কারণে অনিন্দ্য সুন্দর বৈশিষ্টমন্ডিত উৎসব। পৃথিবীতে প্রচলিত অধিকাংশ বর্ষপঞ্জির উৎপত্তি কোনো না কোনো ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু বাংলা নববর্ষের সঙ্গে ধর্মীয় অনুসঙ্গ নেই। মূলত কৃষিকাজ ও খাজনা সংগ্রহের ব্যবস্থাকে ঘিরে এর প্রচলন, পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবসা-বানিজ্যের দেনা-পাওনার হিসাব মেটানো। দিনে দিনে পহেলা বৈশাখ হয়ে ওঠে এক সর্বজনীন সাংস্কৃতিক আনন্দ-উৎসব। আমরা স্মরণ করতে পারি, সম্রাট আকবরের সময় খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য বাংলা নববর্ষ চালু হয়। এর পর থেকে নববর্ষকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীরা সারা বছরের হিসাব-নিকাশ করে থাকেন, হালখাতা খোলেন। ক্রেতারা বকেয়া শোধ করেন। শত শত বছর ধরে এ ধারা চলে আসছে। আশার কথা, বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করে বৈশাখী অর্থনীতি বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, আমাদের চিন্তাচেতনা, মনন ও প্রাত্যহিক জীবনেও বাংলা নববর্ষ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠুক। স্বাগত ১৪৩১।

রাজ্যপালের বপু

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

সাতসকালে টেলিফোন যন্ত্রটি ত্রি রিং ত্রি রিং ত্রি রিং শব্দে লাফিয়ে উঠতেই এস ডি ও সাহেব সেটি তুলতেই ওপাশে ভরাটগম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনতেই বুঝলেন জেলাশাসক কিছু বলছেন তাঁকে।

– স্যার, বলতেই শুনলেন, মুখার্জি, আপনার এক অতিথি আসছেন আগামী পরশু সকালে। অতিথি শুনে ভুকুতে কুঞ্চন জাগে এস ডি ও সাহেবের, জিজ্ঞাসা করে, কে স্যার ?

– রাজ্যপাল নুরুল হাসান আসছেন আই আই টি -তে। আপনার খুব বেশি কাজ নেই, শুধু কলাইকুন্ডা গিয়ে রিসিভ করলেই হবে। বাকি দেখভাল করবে আই আই টি।

– তাঁর কাজ তা হলে আই আই টি -তেই ?

– হ্যাঁ, ওদের কনভোকেশনে ভাষণ দেবেন গভর্নর। আই আই টি -তে প্রতি বছরই কনভোকেশনে একজন হাই প্রোফাইল ব্যক্তিত্ব আসেন ভাষণ দিতে। সেন্ট্রাল মিনিস্টাররাও আসেন কোনও কোনও বছর।

– সঙ্গে আর কেউ আসছেন, স্যার ?

– হ্যাঁ, রাজ্যপালের সঙ্গে ওঁর বোন থাকবেন। তা নিয়েও কোনও চিন্তার কারণ নেই। ওঁরা খুব নির্ঝঞ্ঝাটের মানুষ।

কিছুক্ষণ পরেই মুখার্জি সাহেবের খুঁতখুঁতে মন আবার জিজ্ঞাসা করলেন ডি এমকে, স্যার, রাজ্যপালের মেনু নিয়ে কোনও স্পেশাল ইনস্ট্রাকশন কি আছে ?

ডি এম টেলিফোনে জানালেন গভর্নরের নিজস্ব কুক তার লোকজন নিয়ে কাল বিকেলেই এসে পৌঁছাবে আই আই টি -তে। তারাই রান্নাবান্না করে খাওয়াবে ওঁদের।

রাজ্যপাল নুরুল হাসানকে কখনও দেখেননি মুখার্জি সাহেব, তবে খবরের কাগজে অসংখ্য ছবি দেখে

তার সম্পকে সবটা জানা যায় তা নয়। এহ সব হাহ প্রোফাইল ব্যক্তিত্ব ট্যাকল করা খুব দুরূহ তা তাঁর এগারো - বারো বছরের চাকরিজীবনে প্রমাণ পেয়েছেন বহুবার। একবার চিফ মিনিস্টার সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী সুন্দরবনে গিয়ে প্রবল গরমে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে চাওয়ায় মুখার্জি সাহেব যা ভয়ংকর বিপদে পড়েছিলেন তা মনে থাকবে অবশিষ্ট জীবন। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় কোল্ড ড্রিঙ্কস পাওয়াই এক সমস্যা, বহু তোলপাড় করে কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল জোগাড় করা, দিয়েছিল সে আবার 'গরম' কোল্ড ড্রিঙ্কস।

ফ্রিজবিহনে সেই জুনের হলকায় ভিতরের পানীয় হাঁসফাঁস করছিল জ্বরে।

জেলাশাসকের বাক্যে খুব একটা যে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল তা নয়, তবু রাজ্যপাল যে তার এলাকায় কোনও কিছু ভিজিট করতে আসছেন না সেটা বাঁচোয়া। রাজ্যপালের প্রোটোকল খুব ভারিক্কি ধরনের। পান থেকে সুপুরিটি খসলে চাকরি নিয়ে টানাটানি।

তবে গন্তব্য যেহেতু আই আই টি, কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে কেননা খড়গপুরের আই আই টি-র খ্যাতি ভারতজোড়া, তাদের আপ্যায়নও বিখ্যাত।

এস ডি ও মুখার্জি সাহেব অতএব কিছুটা নিশ্চিন্ত।

সেদিনই ওয়ারলেস মারফত পেয়ে গেলেন রাজ্যপালের ট্যুর-প্রোগ্রাম। কলকাতা রাজভবন থেকে সকাল আটটায় রওনা হয়ে রাজ্যপাল কলাইকুন্ডা পৌঁছবেন আধঘন্টা থেকে চল্লিশ মিনিটের মধ্যে। কলাইকুন্ডায় ছোটোখাটো এয়ারপোর্ট আছে, সেখানে হেলিকপ্টার থেকে ল্যান্ড করতে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। সেখানে প্রশাসনের তরফ থেকে উপস্থিত থাকতে হবে মহকুমাশসককে, রাজ্যপাল পৌঁছোনোমাত্র তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়ার জন্য হাজির থাকবে পুলিশের একটি বড়ো স্কোয়াড, উপস্থিত থাকবেন আই আই টি -র ডিরেক্টর ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। পুলিশের স্যালিউটপর্ব শেষ হতে রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা জানিয়ে এতগুলি গাড়ির কনভয় নিয়ে যাবে আই আই টি - গেস্ট হাউসে।

পি ডবলিউ ডি-র কর্তাদের কাছে খবর গেল তাঁরা যেন কলাইকুন্ডা গিয়ে দেখে আসেন হেলিপ্যাডটি ঠিকঠাক তৈরি আছে। প্রয়োজনে ঝাড়পোঁছ করে রাখেন হেলিপ্যাড যাতে কলকাতার হেলিকপ্টার ল্যান্ডকরতে কোনও অসুবিধে না হয়। তাদের ইঞ্জিনীয়াররা মস্ত ঘাড় নেড়ে 'সব ঠিক সময়ে হয়ে যাবে, স্যার' বলে প্রস্থান করল কলাইকুন্ডার উদ্দেশে।

সব ঠিক সময়ে হয়ে যাবে জেনে মুখার্জিসাহেবও নিশ্চিন্তে নিজের অন্য কাজে মন দিলেন সেদিনকার মতো। পরদিন দুপুরে ইঞ্জিনীয়াররা 'সব ও. কে.' রিপোর্ট দিতে আরও নিশ্চিন্ত। এখন রাজ্যপাল পৌঁছোনোর যা অপেক্ষা।

বিকেলে হঠাৎ ডি এমের ফোন আসতে মুখার্জি সাহেব জানিয়ে দিলেন পি ডবলিউ ডি-র ইঞ্জিনীয়াররা সব ঠিকঠাক বলে রিপোর্ট দিয়েছেন।

ডি এম অতঃপর যে বার্তাটি দিলেন তা মোটেই সুখকর নয়। বললেন, মুখার্জি, একটু আগে রাজ্যপালের এ ডি কং ফোন করেছিলেন, বললেন, গভর্নর যখন হেলিকপ্টার থেকে নামবেন, হেলিকপ্টারের সিঁড়িটা একবার চেক করে নিতে। কোন জেলায় গিয়ে হেলিকপ্টার থেকে নামার সময় সিঁড়িটা এতই পলকা ছিল যে, আর একটু হলেই ভেঙে যেত সিঁড়িটা। আপনি একটু চেক করে নিন তো সিঁড়িটা।

হেলিকপ্টারের সিঁড়ি থাকে পি ডবলিউ ডি-র হেপাজতে। কিন্তু তাদের ইঞ্জিনীয়াররা 'ও কে' বলে রিপোর্ট দিয়েছে, তা হলে নিশ্চয়–

কিন্তু তাদের উপর ভরসা করে থাকলে চলবে না, অতএব সেই সন্ধ্যে হবো - হবো সময়ে মুখার্জি সাহেব প্রথমে ফোন করলেন এলাকার এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে, মি. মাইতি, আপনি কি হেলিকপ্টারের সিঁড়িটা একবার চেক করে নিয়েছেন ?

উত্তর এল, হ্যাঁ, এস ডি ও সাহেব, সব ঠিকঠাক আছে।

কিন্তু তবু মুখার্জি সাহেব যেন দায়িত্বমুক্ত হতে পারলেন না, বললেন, মি. মাইতি, আমি নিজে একবার দেখতে চাই সিঁড়িটা।

–আপনি দেখবেন! এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়াররা একটু অবাক হলেন, বললেন, তেমন দেখার কিছু নয়। এর আগের গভর্নরও তো এই সিঁড়িটা ব্যবহার করেছিলেন। মাত্র এক বছর আগে তৈরি করা।

–তবু একবার দেখে নিই।

অতএব গাড়ি নিয়ে মুখার্জি সাহেব বেরোলেন হেলিকপ্টারের সিঁড়ির খোঁজে। সিঁড়ি ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছে কলাইকুন্ডায়। মি. মাইতিকে নিয়ে সেখানে পৌঁছতে সন্ধ্যে কাবার।

কলাইকুন্ডার এয়ারপোর্টটি খুব জমজমাট না হলেও চারদিকে আলোটালো জ্বেলে দিনের মতো করে রেখেছে, হয়তো কাল সকালে রাজ্যপাল আসবেন জেনে তাদের তৎপরতা যথেষ্ট। সেখানে গিয়ে একটি (ক্ষুদ্রার অফিসঘরে জিরোতে থাকা সিঁড়িটি দেখে বুকের ভিতরটা ছাঁত করে উঠল মুখার্জি সাহেবের। শঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার তাকালেন মি. মাইতির নিশ্চিন্ত মুখের দিকে, বললেন, একবার বাইরে নিয়ে চলুন তো সিঁড়িটা।

বিস্মিত নির্বাহী বাস্তুকার তাঁর এক আজ্ঞাবাহককে আদেশ করতেই সিঁড়িটি চলে এল ঘরের বাইরে। সেটি নির্বিষ্ট মনে পরখ করে মুখার্জি সাহেব বললেন, দেখুন তো, মি. মাইতি, এই সিঁড়ি রাজ্যপাল নুরুল হাসানের ভার নিতে পারবে কি না।

নির্বাহী বাস্তুকার সামান্য নড়েচড়ে উঠে বললেন, আপনি বলছেন সিঁড়িটা রাজ্যপালের ভার বহন করতে পারবে না।

– রাজ্যপালকে আমি চোখে দেখিনি, কিন্তু কাগজে ছবি যা দেখেছি, তিনি বেশ ওভারওয়েট।

– ওভারওয়েট।

– খুবই ওভারওয়েট। এতক্ষণে মুখার্জি সাহেব তাঁর জেলাশাসকের সতর্কবাণীর সারবত্তা উপলব্ধি করেন। বললেন, মি. মাইতি, এই সিঁড়ি আগের রাজ্যপালের ভার বহন করে থাকতে পারলেও বর্তমান রাজ্যপালের ভার নিতে নাও পারতে পারে। এখনই একটা নতুন সিঁড়ি তৈরি করতে হবে।

– এখন, এই রাত্রিবেলায়। মি. মাইতি ভেবে কুল করতে পারেন না, বললেন, কাল সকালেই তো রাজ্যপাল পৌঁছবেন।

– কোনও ঝুঁকি নেওয়া যাবে না, মি. মাইতি। এই সিঁড়িটার কাঠ তেমন শক্তপোক্ত নয়। আপনি চলুন, কোনও কাঠের দোকানে যেখানে সিঁড়ি তৈরি করা যাবে।

হতভম্ব একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে মুখার্জি সাহেব চললেন খড়গপুরের বিখ্যাত কাঠের গোলায়। তাঁর নিজেরও তখন বেশ টেনশন হচ্ছে। এলাকায় ভি আই পি এলেই কোনও না কোনও ভাবে সমস্যা গজিয়ে ওঠে যা রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। অতএব কাঠের আড়তে গিয়ে আড়তওয়ালাকে বিষয়টি বোঝাতেই তিনি লম্বা সেগুনগাছের মগডাল থেকে লাফিয়ে নামলেন, হেলিকপ্টারের সিঁড়ি বানানো কি চাট্টিখানি কথা।

মুখার্জি সাহেব তাঁকে বোঝালেন, দেখুন, এ হল জেলার প্রেস্টিজ রক্ষার ব্যাপার। যে করেই হোক, আজ রাতের মধ্যেই সিঁড়ি তৈরি করে দিতেই হবে আপনাকে।

আড়তওয়ালা গলা বেশ বাজখাঁই ধরনের, অনেকক্ষণ গাঁইগুঁই বললেন, কত ওজন আপনাদের রাজ্যপালের ?

মুখার্জি সাহেব তাকালেন নির্বাহী বাস্তুকারের দিকে, এই রে, রাজ্যপালের ওজন কত তা কী করে জানা যাবে।

– এক টন ?

মুখার্জি সাহেব তখন ভেবে পাচ্ছেন না রাজ্যপালের ওজন কত তা কাকেই বা জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। তাঁর উধবর্তন কর্তৃপক্ষ জেলাশাসককে তো আর জিজ্ঞাসা করা যায় না, স্যার, গভর্নরের ওজন কত। আমতা-আমতা করে তাঁর হাতদুটো প্রসারিত করলেন দুদিকে, ধরুন এরকম মোটা।

আড়তওয়ালা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে দুই সাহেবকে নিয়ে গেলেন তাঁর গোলার মধ্যে, সেখানে বহু পেল্লাই চেহারার সেগুনগাছের গুঁড়ি অপেক্ষা করছে চেরাই হবে বলে। সেগুলির একটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করলেন, এইসান মোটা ?

মুখার্জি সাহেব তখন জরিপ করছেন পাশাপাশি জিরোতে থাকা মোটা মোটা কান্ডগুলির দিকে। তাঁর সম্মতি পেলেই সেই মতো সিঁড়ির কাঠের থিকনেস হবে। মুখার্জি বুঝলেন খুব কঠিন সমস্যার মুখোমুখি তিনি। তাঁর দেওয়া মাপ বুঝে নিয়ে সেরকমই কাঠ চেরাই হবে এখনই। রাত হয়ে আসছে, সময়ও আর বেশি নেই, এখন ঈশ্বরের উপর ভরসা করা ছাড়া কী উপায়।

এরকম তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে বহুবার নিয়েছেন, আবারও একবার নিতে হল এই মুহূর্তে। সেগুনগুঁড়ির চেহারা দেখে রাজ্যপালের বপুর এবকটা আন্দাজ করতে পারলেন আড়তওয়ালা। সেই মতো নির্ধারিত হবে রাজ্যপালের শরীরের ওজন, সেইমতো সিঁড়ির কাঠের ঘনত্ব করে তবে কাজটা শুরু করতে হবে

আড়তওয়ালাকে।

তদ্দণ্ডেই আড়তের লোকজনকে ডেকে শুরু হয়ে গেল কাজ। হেলিকপ্টারের সিঁড়ি তৈরি খুব সহজ কাজ নয়, তাও এক রাতের মধ্যে।

রাতে মুখার্জি সাহেবের প্রায় ঘুম হল না। সত্যিই এক রাতের মধ্যে সিঁড়িটা তৈরি হবে কি না, আর যদি হয়ও সেই সিঁড়ি রাজ্যপালের ভার বহন করতে পারবে কি না। যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, তার সম্পূর্ণ দায় এস ডি ও - র কাঁধেও বর্তাবে। প্রথম আশঙ্কাটি দূর করতে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে নির্দেশ দিলেন, পুর্বতন সিঁড়িটি যেন হেলিপ্যাডের কাছে প্রস্তুত থাকে। দ্বিতীয় আশঙ্কাটি আপাতত দূর করা যাবে না, যতক্ষণ না রাজ্যপাল নির্বিঘ্নে অবতরণ করবেন হেলিকপ্টার থেকে।

রাত ফুরোতেই প্রস্তুত হয়ে মুখার্জি সাহেব রওনা দিলেন কলাইকুন্ডা হেলিপ্যাডের উদ্দেশে। তার আগে জেলাশাসককে ছোট্ট করে বলে রেখেছেন সিঁড়ির ঘটনাটা। গলা নামিয়ে বলেছেন, স্যার, রাজ্যপালের ট্যুর প্রোগ্রাম যখন জেলায় আসে, তাঁর ওজনটাও সেখানে নোট করে দেওয়া উচিত।

কলাইকুন্ডায় পৌঁছে মুখার্জি সাহেব দেখলেন বিশাল পুলিশবাহিনী প্রস্তুত গার্ড অফ অনার দেওয়ার জন্য। কিন্তু তার আগেই তো তাঁর অগ্নপরীক্ষা।

যথাসময়ে হেলিকপ্টার এসে পৌঁছল হেলিপ্যাডে। এক রাতের মধ্যে তৈরি করা সিঁড়িও তার ঝকঝকে চেহারায় প্রস্তুত রাজ্যপালকে রিসিভ করবে বলে।

হ্যাঁ, মি. সিঁড়ি ঠিকঠাক রিসিভও করল মহামান্য রাজ্যপালকে। কিন্তু তিনি নীচে নেমে যখন শরীর দুলিয়ে আসছেন গার্ড অফ অনার নিতে, মুখার্জি সাহেব একবুক কম্পন নিয়ে দেখলেন, তিনি আন্দাজে তাঁর বপুর মাপ অনেকটাই বড়ো করে যা দেখিয়েছিলেন, রাজ্যপালের বপু তার চেয়েও বড়ো। ওঃ, খুব গেরোর দিন গেছে।

শ্রীনিকাজানা টেক্সটাইলস

প্রাইভেট লিমিটেড

হোলসেল রেটে
রিটেল সেল

মুম্বাই গারমেন্টস

অভিজাত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান

ঘাটাল
7076485553

বকুলতলা
8170880046

ফরিদপুর
8967613187

আনন্দী

রতনতনু ঘাটী

চব্বিশে এপ্রিল আনন্দীর জন্মদিন। আজ নন্দনের সামনে আনন্দদীর আসার কথা। সাড়ে চারটার সময়। প্রতিটি জন্মদিনে আনন্দী আগ্নেয়র সঙ্গে ওখানেই মিট করে। আজ কত বছর ধরে! রেস্টুরেন্টে গিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো বায়না করে, আমাকে খাওয়াতে হবে কিন্তু, সকাল এগারোটার পর থেকে আজ আকাশে যেন সমুদ্রের ঢেউ উথাল-পাথাল। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, ওয়েদার ফোরকাস্টের চেয়ে কম গতিবেগে হলেও বাতাস জোরেই বইছে। বাজও পড়ছে। তত ঘন ঘন না হলেও, বাজ তো পড়ছেই। বেশির ভাগ মেয়ের মতোই আনন্দীও আরশোলা এবং বাজ পড়াকে খুব ভয় করে। আগ্নেয় যে জেন্টস পিজির তিনতলায় থাকে, তার জানলা দিয়ে দূর কে বেশ কাছে দেখায়। যেমন আনন্দীকে যত বেশি দূরের বলে মনে হয়, আসলে আনন্দী তার চেয়ে খুব খুব কাছের। অমন একেবারে কাছের দেখায় আনন্দীকে। এই অল্প বৃষ্টি আনন্দীর নন্দনের সামনে আসার সম্ভাবনাকে বিলীন করে দিয়েছে বলা যায়। এই বৃষ্টিতে আনন্দী আসবে না। না কি আসবে ? আজ যে ওর জন্মদিন! না এসে কি পারবে ?

পাঁচবার নিজে নিজে হেড-টেল করল আগ্নেয়। পাঁচবারই আনন্দীর আসার সম্ভাবনার উত্তরে টেল পড়ল। মন খারাপ নিয়ে কাগজের টুকরো কেটে ছেলেবেলার চোর-ডাকাত-চৌকিদার-পুলিশ খেলার মতো করে আনন্দী আসবে এবং আনন্দী আসবে না' লিখে যতবার উপরে ছুড়ে দিয়ে কাগজের টুকরো গুলো কুড়োল, ততবারই উঠল...'আনন্দী আসবে না'! আগ্নেয়র পাশের রুমে থাকে ত্রিদিবেশ। বৃষ্টির জন্যে অফিস কাট করেছে। বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে বুকের উপর ল্যাপটপ নিয়ে গুগল ঘাঁটছে। আগ্নেয় ওর ঘরে গিয়ে দুম করে প্রশ্ন করল, 'ত্রিদিবেশ আজ আনন্দী আসবে কি আসবে না ?' ত্রিদিবেশ কক্ষনো প্রেমট্রেম করেই না। তার কোনও বান্ধবী আছে, এ পর্যন্ত কেউ কখনো শোনেনি। তাই আগ্নেয়কে

উতলা হয়ে প্রশ্ন করতে শুনে ল্যাপটপটা পাশে সরিয়ে রেখে বিছানায় উঠে বসল ত্রিদিবেশ। দু'হাতে চোখ দুটো কচলে নিয়ে মিটিমিটি হেসে বলল, 'আনন্দী কার বান্ধবী, তোর না আমার ?' বুক চিতিয়ে জোর গলায় আগ্নেয় বলল, 'অফকোরস আমার!' বলে ডান হাতের তর্জনীটা নিজের বুকে ছোঁয়াল।

'তা হলে তুই প্রশ্ন টা নিজেকেই কর না! উত্তর পেয়ে যাবি। আমাকে করছিস কেন ?'

'আরে ধ্যুত কতবার তো লটারি করলাম, কিন্তু প্রতিবারই নেগেটিভ অ্যানসার উঠল!'

এবার আড়মোড়া ভেঙে নিয়ে ত্রিদিবেশ জিজ্ঞেস করল 'প্রবাবলিটি কি বলছে ?'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আগ্নেয় তাকিয়ে রইল ত্রিদিবেশের মুখের দিকে, ইশ এমন দুর্ভাবনার মুখে কেউ অঙ্ক নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে ? যে পারে সে হয় উন্মাদ, নয়

তো সে খুনি। হাসতে হাসতে মানুষ খুন করায় তার জুড়ি নেই।

ত্রিদিবেশ বলল, 'আনন্দীর আজ নন্দনের সামনে আসার সম্ভাবনা কতখানি। সেটাই জানতে চাইছিস ? একটা কথা জানিস তো, সম্ভাবনা ব্যাপারটি হল অনিশ্চয়তার একটি পরিমাপ ? মানে সম্ভাবনা থাকলে তার সঙ্গে অনিশ্চয়তাকেও কিন্তু ঝেড়ে ফেলতে পারিস না।'

আগ্নেয় গলা চড়িয়ে বলল, 'আনন্দী আজ বৃষ্টির মধ্যেও নন্দনের সামনে আসবে কিনা সেটাই বল ? অত জ্ঞান দিস না, প্লিজ!' বলে নিজের রুমে চলে গেল আগ্নেয়। আগ্নেয়র মন বলছে, আনন্দী ঠিক আসবে। তবে সেই ভয়টা ওকে স্থিরও থাকতে দিচ্ছে না। ও এবার প্রবাবলিটি মেলানোর চেষ্টা করল। সেবার গাদিয়াড়া জায়গাটার নাম শুনে নাক সিঁটকে আনন্দী বলেছিল, 'তুমি বেড়াতে যাওয়ার আর জায়গা খুঁজে পেলে না ? ক'দিন পরে যে মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে, তাকে নিয়ে কেউ গাদিয়াড়া যায় বলে তো শুনিনি!'

আগ্নেয় বলেছিল, 'একদিকে রূপনারায়ণ, আর একদিকে ভাগিরথী। মাঝখানে আমরা দু'জন! মাঝি দাঁড় বেয়ে ডিঙি নৌকো নিয়ে ভেসে চলে যাবে দূর গ্রামে। আর সামনে বিস্তির্ণ নদীতীর! প্রিয়জনকে কাছে পাওয়ার পক্ষে এমন জায়গা মন্দ কী ?

'ভাল মন্দ জানি না। আমার গাদিয়াড়া নামটা শুনেই গোটা শরীর ঘিন ঘিন করছে। অ্যা ম্যা গো! যাও তোমাকে বিয়েই করব না! আমার বাড়ির লোক শুনলে কি বলবে একবার ভেবে দেখেছো ?'

তোমার বাড়ির লোক একথা শুনবে কেন ? তুমি বলতেই বা যাবে কেন ? কথা দিচ্ছি, আমরা সুর্যাস্তটুকুও পর্যন্ত দেখবো না। ফিরে আসব 'বাই বাই গাদিয়াড়া বলে!'

'বাড়িতে কথাটা বলতে হবে না!' চোখে কপট ভঙ্গি করে বলল আহেলি 'শুনে বাড়ির লোক বলবে, এ কি ছেলে রে বাবা! যে ছেলে বান্ধবীকে নিদেন পক্ষে দিঘা বা মুকুটমণিপুর নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দেখাতে পারে না, তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা দশবার ভেবে দেখা দরকার।'

গাদিয়াড়া যাওয়ার প্ল্যানটা অরিজিনিয়ালি আগ্নেয়রই। আনন্দীর এত গাঁইগুঁই শুনে আগ্নেয় জিজ্ঞেস করেছিল, 'এ কি ? তুমি বিয়ের আগে তোমার হবু বরের সঙ্গে গাদিয়াড়া বেড়াতে যাওয়ার খবরটা বাড়িতে বলতে যাবে কেন ? ওখানে গিয়ে তোমাকে যদি কিসটিস করিও, সেটাও বাড়িতে এসে মাকে বলে দিবে নাকি ?' গলায় বিস্ময় ছড়িয়ে জিজ্ঞেস করল আগ্নেয়।

'ও কান্ডটি করতে যেও না! তাহলে বিপদে পড়বে! তুমি তো আহেলিকে চেনো না।'

এত কথার পরও সেবার ধর্মতলার দূরপাল্লার বাসগুমটির সামনে ঠিক সকাল ন'টার সময় আনন্দী জারুল রঙের শাড়ি পরে লটর পটর করতে করতে এসেছিল, ঠিকই এসেছিল আনন্দী। গাদিয়াড়ার বাসে পাশাপাশি দুটো সিটে বসার পর কখন যে হুশ করে এসে গিয়েছিল গাদিয়াড়া! নদীর ধার ঘেঁষে একটা গাছ ছিল। আহেলি বলেছিল, 'জানো তো, এই গাছটার নাম রাধাচূড়া! একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ওর পাশে থাকলে বেশ হতো! চলো ওর নিচে বসি!' একটু দূরে ইরিগেশনের বাংলোর কয়েকখানা ঘর দেখা যাচ্ছে। লোক জন কেউ নেই।

আগ্নেয় মুখটা নামিয়ে ডাকল, 'আহেলি!'

আনমনে উত্তর ভেসে এল আহেলির কাছ থেকে, 'উঁ ?'

'জায়গাটা কেমন ?'

'খুব সুন্দর! এখানে আসার আগে যখন জায়গাটার কথা তুমি বলেছিলে, আমার এমন মনে হয়নি। এখন মনে হচ্ছে, জায়গাটা ঠিক তোমার মতোই! বিউটিফুল!'

আগ্নেয়র তখন কী যে মনে হয়েছিল হয়তো রূপনারায়ণই জানে! নাকি ভাগীরথী ?

নাকে ভেসে আসছিল আহেলির শরীরের চাঁপা ফুলের সেই মিষ্টি গন্ধটা! হুট করে আহেলির কাঁধে মাথা রাখতে গেল

আগ্নেয়। ওমনি ওকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে আহেলি খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল 'উঁহু। কিপ সোশ্যাল ডিট্যানসিং! চারদিক থেকে কোভিড ভাইরাস তাকিয়ে দেখছে!'

ব্যস, কি যে হয়ে গেল আগ্নেয়র মাথার ভিতর। ওদিকে ভাগীরথীর চূর্ণ ঢেউ। এদিকে রূপনারায়ণের লাজুক মুখশ্রী! দূর থেকে দক্ষিণের বাতাসে কুলকুল করে বঙ্গোপাসাগরের গন্ধ ভেসে আসছে যেন সব কিছু এলোমেলো করে দিতে। মাথার উপর রাধাচূড়া, তারও অনেকটা উপরে নীল আকাশ! হেরে গেল আগ্নেয়। মুখ নিচু করে আহেলিকে চুমু খেল হঠাৎ!

আহেলি ছিটকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাগলের মতো ছুটতে লাগল আহেলি। স্ট্যান্ডে কলকাতার শেষ বাসটা তখনও স্টার্ট দেয়নি। খুব ভয়ে করছে আগ্নেয়র। কেন যে অমন করে ভেঙে পড়ল সে ? পিছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল আগ্নেয়, 'আহেলি দাঁড়াও! একটা কথা শোনো!'

কোনও কথা শুনলো না আহেলি। বাসে দু'জনে পাশাপাশি সিটে বসল। বাসও ছাড়ল। আহেলির হাতটা নিজের হাতে টেনে নিতে গেল আগ্নেয়। আহেলি একঝটকায় ছাড়িয়ে নিল হাতটা। বাসের জানালা দিয়ে বাইরে অন্ধকারের জোনাকি দেখতে লাগল আহেলি। একটাও কথা হল না দু'জনের মধ্যে গোটা পথটা। বাইরের চরাচর তখন নিবিড় অন্ধকারে মুখ ঢেকেছে। ধর্মতলায় যে যার বাসে গৃহমুখী!

আগ্নেয় সেদিনের লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারেনি অনেক চেষ্টা করেও। ফোনও করতে পারেনি আহেলিকে। অতদিন আহেলির কোন খবর না পেয়ে ওর বন্ধু আয়ুশির কাছে গিয়েছিল আগ্নেয় একদিন। শুনল, আহেলি ফরেস্ট সার্ভিসের পরীক্ষা দিয়েছিল। হঠাৎ সিলেকশানের খবর পেয়েছে। তারপর মেডিক্যাল, আরও নানা পেপার জমা দেওয়া, দৌড় ঝাঁপ। মনে হয় আর দেখা করার সময় পায়নি। নাকি আগ্নেয়র সঙ্গে দেখাই করতে চায়নি আহেলি ? একবার আহেলির সঙ্গে দেখা করে সেদিনের জন্যে ক্ষমা চাইবে আগ্নেয়।

আয়ুশি বলল, বাড়ি থেকে আহেলিকে জয়েন করতে না-ই বলেছিল। একটা মেয়ের পক্ষে বন জঙ্গলে থাকতে যাওয়ার কি দরকার ? অন্য চাকরি টাকরি নিশ্চয়ই হয়ে যাবে! সে কথায় কান দেয়নি আহেলি। তুমি তো জানো। ও চিরদিনই ওরকম, একরোখা। নিজে যা ঠিক করে, সেটাই ঠিক। বাড়িতে আহেলি বাবা-মাকে বলেছে, জঙ্গলের চাকরি কেউ কখনও ছাড়ে নাকি ? শুধুই ফাঁকি, আর শুধুই পাখি দেখে বেড়ানো আর প্রজাপতির পেছনে দৌড়ানো।'

ওর বাবা বলেছেন 'এখন আর ফরেস্টের চাকরি সেই আগের মতো নেই রে! এখন জঙ্গল - মাফিয়া আছে, কাঠচোর আছে। পলিটিক্যাল চাপ আছে। স্থিরভাবে তোকে কাজ করতে দেবে ভেবেছিস ?'

আহেলি বলেছে, 'ওসব আমার পক্ষে ম্যানেজ করা এমন কঠিন কিছু হবে না বাবা! দেখে নিও!'

ওসব কথা শোনার পরও আগ্নেয় ভাবল, আজ আহেলি আসবে নিশ্চয়ই। মনে হয় এতদিনে চাকরির ঝামেলাও মিটে গেছে। আজ এসেই হয়তো জয়েনিং লেটারটা দেখাবে! আগ্নেয়ও এই একমাসে ফোনটোনও করেনি! কোনও খোঁজ ও নেয়নি। কারণ ওই একটা লজ্জা ওকে কুরে-কুরে খেয়েছে। আগ্নেয় ভেবেছিল, একেবারে ফাইনাল চমকের অপেক্ষায় থাকবে।

এর মধ্যে আহেলিও ফোন করে নি। আগবাড়িয়ে আহেলি কখনও নিজে ফোন করেও না। এটা ওর অভ্যেস। নিশ্চয়ই খুব রাগ করে বসে আছে। দেখা হলে সব রাগ একসঙ্গে ঢেলে দেবে। বলবে, 'যে ছেলে একমাস ধরে একটা ফোনও করেনি, সে আবার আমার জীবনের ভালমন্দের সঙ্গী হবে কি করে ?'

বিকেল নেমে আসছে মেঘে-মেঘে, বৃষ্টির ওড়না মাথায় জড়িয়ে। সূর্যের দেখা নেই। বরং বৃষ্টির দাপট খানিকটা বাড়ল। চিরদিনই আগ্নেয় দেখা করার সময়ের খানিকটা আগেই পৌঁছে গেছে এতদিন। আজ আরও

আগে পৌঁছতে হবে। আহেলি কত না রাগ নিয়ে আসছে। সামনে এসে রাগে ফোঁস-ফোঁস করবে। কিছুক্ষণ ওর মুখের দিকেই তাকাবে না। এক-আধবার চোখে চোখ পড়ে গেলেও তাতে ভস্ম হতে খুব একটা বেশি সময় লাগবে না আগ্নেয়র। ওকে শান্ত করতে এক আকাশ বৃষ্টির জলও যথেষ্ট হবে না।

তড়িঘড়ি করে আগ্নেয় বেরিয়ে পড়বে ভাবল নন্দনের দিকে। আর দেরি করা ঠিক হবে না! এমন সময় ওর ফোনটা বেজে উঠল। স্কিনের দিকে তাকাল। বাবার ফোন। ফোনটা রিসিভ করতে বাবা বললেন, 'আগ্নেয় শিগগির বাড়ি এসো! তোমার মায়ের শরীরটা ভালো নেই।'

দিশেহারা আগ্নেয় অঝোরে বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়ে পড়ল নারায়ণগড়ের পথে। ভাবল একবার আহেলিকে ফোন করে মায়ের শরীর খারাপের কথাটা জানিয়ে বলবে, 'আহেলি এবার তোমার জন্মদিনে থাকতে পারলাম না!'

ফোনের ওপার থেকে ভয়েস রেকর্ড বেজে গেল, আপনি যে নাম্বারটিতে ফোন করেছেন, সেটির বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই! দিন কুড়ি পর মায়ের পারলৌকিক কাজ সেরে, পিজি তে ফিরে এল আগ্নেয়। পাশের রুম থেকে ত্রিদিবেশ এসে ওর দিকে একটা খাম এগিয়ে দিল। বলল, 'তোর চিঠিটা এসেছে, বেশ ক'দিন হল!'

খামটা খুলে দেখল আহেলির বিয়ের চিঠি! আগামী সাতাশে মে আহেলির বিয়ে।

আগ্নেয় ঝাপসা চোখে মনে-মনে বলল, পৃথিবীতে সব ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ সব সময় পাওয়া যায় না! আনন্দী, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও!'

প্লাবন

শ্যামলী রক্ষিত

নৌকর মত ভাসছে বাজারটা। একেবারে জলমগ্ন। কাল বিকেলেই যখন হঠাৎ ঘন কাল মেঘে ছেয়ে গেল আকাশটা। তখনই মনে হয়েছিল পদ্মার, এত মাল কিনে ফেললুম। ওয়েদার যদি ঠিক না থাকে, তো ডাঁহা লোকসান খাব। এত দাম সব্জিরা, এক পাল্লা পটল কিনা ১৫০ টাকা। ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি না করলে দুপয়সা লাভের মুখ দেখতে পাবে মানুষ ? শুধু তো মাল কিনলুম আর বোজা নে চলে এলুম তা নয়। এস্টেশানে এসে পা দেচ কি, শেতল এসে হাত পাতবে, ওকে ২০ টাকা দাও। টেনে উটে বসেচ কি চেকার এলো, তাকে দাও ৫০ টাকা। ডানকুনিতে, উল্টো ডাঙ্গায় কত যে ভিকিরির দল হাত পেতে আচে তার ঠিক নেই। দিতে দিতেই সব উজার।

ও মাসি কি হল গো ?

হবে আবার কি। দেখছিস তো বাজারের হাল। দে চা দে খাই। মেজাজ বিগ্রে দিস না। এক পয়সা বিক্রি নেই। খরচা ষোলোয়ানা। ভিজে চান করে গেছি। গা গিজ গিজ করছে খুব। বেশিক্ষণ থাকব না।

নাও চা খাও ভাল লাগবে।

সে তো লাগবে রে, মুখপোড়া। কিন্তু চা খাবার পয়সাটা আসবে কোথার থেকে রে।

অন্যদিন পুশিয়ে নিও মাসি। ব্যবসার নিয়মই তো এই। একদিন লাভ, একদিন লোকসান। হঠাৎ গনশা বলল, মাসি তোমার মা আসছে গো।

বুকটা ছ্যাঁক করে উঠলো পদ্মার। এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বাজার আসছে মা ? ভাল মানুষই বেরুতে পাচ্ছে না। সাঁ করে চোখ চলে গেল পুব দিকের গলি রাস্তার দিকে। দাবনার উপরে কাপড় গুটিয়ে তুলে নিয়ে টলতে টলতে আসছে বুড়ি। আর একহাতে ছাতা। অতটা জল পেরিয়ে আসবে কি করে বলো দিগিনি। চায়ের কাপটা ধুপ করে নামিয়ে রেখে উঠে গেল তাড়াতাড়ি, সোজা ওনার কাছে। শক্ত করে ধরল বুড়ির নড়াটা। তারপর গজগজানি

শুরু হলো তার। এরা মানুষ ? না পিচাশ কে জানে বাবা। ভগবানও চোখে কানা। তুমি এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বাজার এয়োচ যে।

কি করব বল ?

মানে ? তোমার মুখ নেই বুঝি। মাথা কিনে রেকেচে নাকি ? নিমোনিয়া হয়ে মরবে যে, সে খেয়াল আচে তোমার ?

মাগো তোর মুখে ফুল চন্নন পড়ুক মা। তাই যেন হয় রে। এই ভেজা যেন কাল ভেজা হয় আমার। আর বাঁচার ইচ্ছা নেই একদম। অনেক দিন এসেছি পৃথিবীতে। এবার মরণটা হলে বাঁচি মা।

চুপ করো তো। বেশি বকুনি তুমি।

আর বেঁচে থেকে লাভটাই কি বল ?

তোমাকে অত নাভ নোকসান দেকতি হবি নি। জেবনটা কি ব্যবসা নাকি

তা জানি মা। ব্যবসা নয়।

তা'ইলে বকচো কেনি।

কি আবার বকলুম ?

হ্যাঁ খুব বোকচো। এবার চুপটি করে এই পিঁড়েতে বসো। চা খাও। বলে গলা তুলে হাঁক দিল, এ গনশা। মাকে একটা পেরজাপতি বিস্কুট আর চা দে।

না মা আমি বিস্কুট খাব না। শুধু চা দে।

কেনে কি খেইচ সকালে। তোমার মহারানি কি বেরেকফাস্ট কইরে পাইটেচে বাজার করতি শুনি।

তা কেন মা। এখন কি জল খাবার সময় হয়েছে ? যে খাব। তাইলে বিস্কুট খেতি আপুত্তি করচো কেনি।

সুনেত্রা আর কিছু বলল না।

এমন জোর, করেই বা কে। নিজের পেটের ছেলেরাই তো সব কেটে পড়ল। আর এই মেয়েটা, কোথায় কোন গাঁয়ে বাড়ি। কে না কে। তাকে চেনে না, জানে না। কত আপন হয়ে গেল। বাজার তো করে কত। গাঁ থেকে টাটকা দেশি শাক আনে মেয়েটা। তা বুড়ির আবার হিংচে শাক খুব প্রিয়। দু একদিন পর পর শাক নিতে এলাম যখন। কি মনে হয়েছিল, কি জানি ? মেয়েটা আগ বাড়িয়ে কথা বললে। মাসি তোমার বাড়ি কোথায়। তোমার কে কে আছে। এখানে কোথায় থাকো। এই সব কথা। তার পর আস্তে আস্তে সব জেনে গেল যখন, কেমন মায়ায় জড়িয়ে পড়ল মেয়েটা। বললে ছেলেরা ছেড়ে চলে গেচে তো কি হয়েছে মা। আমি তো আছি, তোমার মেয়ে। আমার মাও কুব কষ্ট নিয়ে মরেছে মা গো। আমি জানি। ছেলেরা না দেখলে কি হয় বুকের ভিতরি। তার পর থেকে যত দিন যাচ্ছে, তত যেন মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেলছে মেয়েটা। কত হেঁজ্জা হেঁজ্জি। এখানের কাজ ছেড়ে ওর বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। কত বুঝিয়ে পাড়িয়ে থাবারি দিয়ে রেখেছি যে তার ঠিক নেই।

কি হল, ও মা। চা তো তোমার ঠান্ডা হয়ে গেল গো। খাও। কি যে অত ভাব বুজি না বাপু।

কি আর ভাবব বল মা।

কি আবার ভাববে। ভাইদের কতা ছাড়া।

কি করব মা। পেটের শততুর যে। মাঝে মাঝে খুব অবাক লাগে। মনে হয় আমার পেটের ছেলে হয়ে এরা এমন স্বভাবের হল কি করে! সত্যিই ভেবে পাই না মা। অথচ ছোটোর থেকে তো ঠিক এমনি ছিল না। কেন যে এত পালটে গেল। কিসের জন্যে যে কে জানে। শমুর তো বাবাকে ছাড়া একটা মুহুর্তও চলত না। চোখের আড়াল হবার জো ছিল না মানুষটার। বাবা কোথায় গেল। আমাকে নিয়ে গেল না কেন। কখন বাড়ি আসবে। একেবারে অস্থির করে দিত।

তোমার কি হয়েছে বলো তো। শরীর ঠিক নেই না কি ? এই বিষ্টি মাতায় করে এলে কেনে

একদিন না বাজার এলি মহারানির চলে না বুজি। মুখের উবরি বলবে তো, এই দুর্যোগে বেরুব না।

তা কি বলা যায় মা। পরের বাড়ির কাজ। নিজের ইচ্ছা মতন তো হবে না। বসে বসে কি মাইনে দেবে ?

দেবে না তো দেবে না। অমন কাজের মুখে নাতি মেরে চলে এসো না। কি দরকার তোমার মা। এত বয়েস হয়েছে তোমার। আর পারবে কেনে। জেবনের শেষ কটা দিন একটু শান্তিতে থাকো। আর ক'দিনই বা বাঁচবে বলো। মেয়ে বলে যদি মানতে তাইলে ঠিক এই মেয়ের কথা শুনতে। আমি যদিন তোমার পেটের মেয়ে হতুন, পারতে তুমি থাকতে ? মেয়ের শুকনো মুখ দেখে, ঠিক চলে আসতে তখন।

মানব না কেন মা। খুব মানি। তুই তো আমার মেয়েই রে। পাগলি মেয়ে।

তার পেরমান তো পাচ্ছি মা।

রাগ করিস না মা। জীবনে অনেক দেখেছি, অনেক খেয়েছি। ভালবাসা দুঃখ যন্ত্রণা অনেক পেয়েছি। আমার কোনো আক্ষেপ নেই। যখন যেমন সময় এসেছে, তখন তা মেনে নিয়েছি। এবার বয়েস হয়েছে মা। বিছানায় পড়ে থাকার চেয়ে মরণই ভাল।

তুমি কোনো পাপ করোনি মা, যে শুয়ে মুতে পড়ে থাকবে। আর ঠাকুর না করুক, যদি কিছু হয়ও। তোমার এই মেয়ে তোমাকে পেলবে না মা।

আমি জানি রে মা। তোর মুখ চেয়েই তো বেঁচে আছি। তবু, চলতে ফিরতে যদি যেতে পারি মা, তাই ভাল। কথায় বলে নিত্য নেই দেয় কে। নিত্য রুগি দেখে কে ?

তোমার কোনো চিন্তা নেই। তোমার এই মেয়ে তোমায় ফেলবে না।

বেঁচে থাক মা। তুই সুখি হ'। ছেলেরা তোর রাজা হোগ। সুনেত্রা একেবারে অন্তর থেকেই আশীর্বাদ করল পদ্মাকে। তার পর কেমন গম্ভীর হয়ে উঠল মুখ চোখ তার। চোখের পাতায় চিক চিক করছে জলরেখা। দেখলেই বোঝা যায়, বুকটা ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে তার। এরপর পদ্মা আর কিছু বলল না। সুনেত্রা তখন মধুর একটা চিত্র কল্পের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘন সবুজ লনে পা ফেলে ফেলে হেঁটে চলেছে সে একা। কি সুখের সেই অনুভূতি। শমু, রুমু দুই ভাইয়ে খুন সুটি করছে। স্কুল যাচ্ছে। বাড়িতে হৈ হৈ কার। আর মানুষটাও ছেলেদের নিয়ে তেমনি মেতে থাকত। আজ চিলি চিকেন করব। কাল মাংসের পকোরা। বছরে দুটো টুর। হৈ হুল্লোর বেড়ানো, খাওয়া আর ছেলেদের লেখাপড়া, এতেই ব্যয় হয়ে যেত সব। রিটায়ার করার পর কোয়াটার ছেড়ে ভাড়াবাড়ি নিয়ে উঠে যেতে হল যখন। অদ্ভুতভাবে পালটে যেতে থাকল ওরা দু'ভাই। বছর খানেকের মধ্যে দুজনেই চাকরির দোহাই দিয়ে চলে গেল যে যার মত। বড় দুর্গাপুরে ফ্ল্যাট কিনলে। রমু কলকাতায়। তাও বুড়োবুড়ি কেটে যাচ্ছিল ভালোই। খারাপ লাগছিল বটে। তবে মন্দ কাটছিল না তেমন। কিন্তু সব শেষ হয়ে গেল, সারদা কান্ডে। মানুষ টা যে এত বোকা, তা আগে বুঝিনি কোনোদিন। সমস্ত টাকা নাকি সারদায় রাখা ছিল। সব মিলিয়ে পনেরো লাখ টাকা। শোক সামলাতে পারছিল না। কেমন গুম হয়ে বসে থাকত। নিজের মনেই বসে বসে বিড় বিড় করত। মুখে কোনো কথাই বলত না। বন্ধু বান্ধব সব ছেড়ে ঘরেই বসে থাকত দিন-রাত। কারুর সংগে মিশত না। কথা বলত না। সব সময় একলা থাকতে চাইত। মাস খানেক পর একদিন বিছানা ছেড়ে আর উঠলই না। কোনো সাড়া শব্দ নেই মানুষটার। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করল। ঘুমের অসুধ খেয়ে ছিল রাত্রে। নিঃশব্দে চলে গেল সে।

ছেলেরা কাজ কর্ম ভাল করেই করলে। টাকা পয়সাও ভালোই খরচা করেছে বাবার কাজে। ধুম ধাম করে লোক-জন খাইয়েছে। শ্রাদ্ধ শান্তিও করেছে বেশ ভাল করে। লোকে ওদের পিতৃভক্তি দেখে ধন্য ধন্য করেছে। কাজ কর্ম মিটে যাবার পর অবশ্য মাকেও নিয়ে যাবার জন্যে কম বলে নি। দুজনেই নিয়ে যেতে চেয়েছিল তাকে। কিন্তু কারুর কাছেই আর যেতে ইচ্ছা করে নি সুনেত্রার। এর বাড়ি তার বাড়ি করে ঘুরছিল। শেষে বুল্টি, সুনেত্রার বোনঝি তার বন্ধুর শাশুড়ির বাড়ির এই কাজটা দেখে দিয়েছে। বুড়ি একা থাকে। বয়েসে সুনেত্রার চেয়ে ছোটোই হবে। ছেলে বিদেশে থাকে। টাকা পয়সার অভাব নেই। মায়ের যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, তাই এই ব্যবস্থা। সুনেত্রার পোড়া কপাল। কি জীবন ছিল আর কি জীবন সে পেলো।

ছোটোবেলায় -কি আদর যত্ন। পারলে বাবা মাটিতে পা ফেলতে দেয় না মেয়েকে। মেয়ে অন্ত প্রাণ। বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ দেখে ঠাকুর্দা নাম রেখেছিলেন সুনেত্রা। কি দারুণ গান গাইতে পারে এখনো। রবীন্দ্র সংগীত। মাঝে মাঝে পদ্মার কাছে এসে বসে যখন। সবাইমিলে ধরলে গান শোনায় সেদিন। লোক জড়ো হয়ে যায়। বাজার সুন সান নিশব্দ। শুধু গানের সুর ভেসে বেড়ায় বাজার চত্বরে।

অনেক্ষণ চুপ করে আছে দেখে পদ্মা বলল, কি হয়েছে মা ?

কি আবার হবে বল। বুড়ো মানুষের শরীর। এই ভাল তো এই মন্দ।

আর তুমি শরীর খারাপ নেয়ে এয়েচো এই বৃষ্টিতে বাজার করতে।

কিছু হবে না রে মা। তুই আমার জন্যে ভেবে

ভেবে মরবি এবার।

এরপর পদ্মা আর কোনো কথাই বলল না, মনে পড়ে গেল তার দুখিনি মায়ের সেই বিষণ্ণ গম্ভীর ছল ছল মুখ। দাদারা একমুঠো ভাত পর্যন্ত দিত না। রোগ ডেরি হলে উকি মেরে দেখত না একবার। ছেলেদের অবস্থা ভাল নয়। মায়ের কিচ্ছু দাবি ছিল না ওদের কাছে। একটু ভালবেসে মা বলে কাছে এসে বসে না পর্যন্ত ছেলে দুটো। এই দুঃখে কেঁদে সাড়া হয়ে যেত মা। তিন দিনের জ্বরে অবস্থা যখন একেবারে খআরাপ, বললে, মা একবার তোর দাদাদের ডাক। শরীরটা আমার ভাল লাগছে না। আমি আর বাঁচব না রে মা। তোকে জলে ভাস্যে দে গেনু রে। মায়ের কথা শেষ হয় নি তখনও, কাঁদতে কাঁদতে ছুটেছি দুই দাদার কাছে। ওরা যখন এসে বসেছে মায়ের বিছানার পাসে। মায়ের সেদিনের সেই আকুতি আজও স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। দাদাদের হাত ধরে বলে গেসল, ছোটো বোনটাকে দেখিস বাবা। দেখে শুনে একটা বিয়ে থা দিস।

যে ছেলেরা নিজের মাকে চোখে দেখেনি। তারা দায়িত্ব পালন করবে বোনের ? সেদিন ই মা চলে গেল। তারপর শুরু হলো লড়াই। সে অনেক ইতিহাস। তারপর থেকে বুড়ো মানুষ দেখলেই বুকের ভেতরটা টনটন করে। মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। ভেতর থেকে একটা কষ্ট হয় তার। তার জন্যে কিছু করতে পারলে ভাল লাগে। আর এই মানুষ টার সব কথা শুনে মায়ায় ভালবাসায় একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে।

কি হলো গো মাসি। তোমরা মা বিটিতে মুখ ভার করি বসে আছো যে। দাও পয়সাটা দাও আগে।

হ্যাঁ হ্যাঁ নে বাবা। পয়সা তো দিতেই হবে। পেরজাপতি বিস্কুট দুটো ৬ ট্যাকা আর চা ১০ ট্যাকা। মোট ১৬। নিয়ে যা।

গনশা টাকাটা নিয়ে চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ সময় চুপচাপ নিঃশব্দে বসে থাকলো মা বেটিতে।

সুনেত্রার শরীরটা আজ ঠিক লাগছে না। বাড়ি গিয়ে একটু শুতে পারলে ভাল লাগত। কিন্তু এখন তো শোবার যো নেই। বাজার থেকে ফিরে আগে হিংচের বড়া ভাজতে হবে। বুড়ি মুড়ি দিয়ে খাবে। তার পর রান্না চাপাতে হবে। কাজেই এখুনি শোয়া সম্ভব নয়। বড়া ভাজতে হবে মনে পড়ে গেলো যেই, অমনি ধড়ফড় করে উঠে পড়ল সুনেত্রা।

পদ্মা বলল কি হল মা উঠছো কেনে ? বসো, একটু পরে তোমাকে দে আসছি।

না মা আর দেরি করব না। বুড়ি রেগে টং হয়ে যাবে। উনি আবার বেশিক্ষণ একা একা থাকতে পারেন না। ভয় পান।

উঁ ভয় পান। ভারী আমার মাতা কিনে রেকেচে রে। আমি তোমার কোনো কতা শুনব না মা। সামনের মাসে তোমাকে নিয়ে চলে যাব গাঁয়ে। দেখবে কত ভাল লাগবে তোমার। কি সুন্দর আমাদের গাঁ। তোমার মন ভরে যাবে মা।

যেই গাঁয়ের কথা বলেছে অমনি চোখের সামনে ভেসে উঠল, সেই কৈশোরের ফেলে আসা কানচিনি নদী, ঘাট-নৌকা আর করুণ মিহি সুরে মাঝিদের ভাটিয়ালি গান। অদ্ভুত ভাবে কানের লতি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ভেসে যাচ্ছে সেসব। বিকেলের পড়ন্ত সুর্যর শেষ রশ্মি এসে পড়েছে ঘাটের সিঁড়িতে। সিম সিম করে হাওয়া বইছে গ্রীষ্মের বিকেলভর। আর দূর থেকে ভেসে আসছে ছপাৎ ছপাৎ দাঁড়ের শব্দ। সান বাঁধানো ঘাটের মাথায় বাবার কোলে বসে গল্প শোনার সেই ছবি। ৬০ বছর আগেকার কথা। তবু কত স্পষ্ট আজও। ওমা কি গো। অমনি হাঁ করে দাঁইড়ে রইলে যে। তোমার যে দেখি সান সর্গ নেই গো। কি হল মা। শরীল খারাপ নাগছে নাকি। আর নাগবে নাই বা কেনে বলো। এই অবস্থায় কেউ বের হয় বাড়ি থেকেন। বয়েস হয়েছে, এত ধকল শরীল নেবে কেনে। পদ্মা বক বক করেই যাচ্ছে।

এদিকে সুনেত্রা একটা ঘন সবুজ লনের উপর পাতা নরম মখমলের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। এই দেশ।

এই সময়, এই বর্ষা দিন, মানুষ জন তার ছেলেরা এমন কি এই পদ্মাও নেই সেই মানচিত্রে। মনিরুল, আয়েষা, শংকরী, শিবানীদের সংগে হাত ধরাধরি করে হেঁটে যাচ্ছে সে একা। চারিদিকে গাছ পালা নদী। আর প্রজাপতির মত রঙ্গিন ডানা মেলে উড়ছে সেই ছোট্ট ফুটফুটে সুনেত্রা। ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে

বাহে কি গো মধু বায়।
কি জানি কিসের লাগি
মন করে হায় হায়।

সুনেত্রা হঠাৎ তালে তালে পা ফেলে নাচতে শুরু করল। গলায় সুর ফুটল তার। বাজারের লোকজন অবাক হয়ে দেখছিল এই দৃশ্য। কেউ কেউ ভাবছিল, পাগল বুঝি। পদ্মা কিন্তু মুগ্ধ নয়ন মেলে দেখছিল এই দৃশ্য। সারা বাজার স্তব্ধ। সুনেত্রা নুব্জ জড়ানো ভগ্ন শরীর নিয়ে গাইছিল আর তালে তালে ঘুরে ঘুরে নাচছিল। কোথায় কোন পরপাড়ে যে ভেসে যাচ্ছিল সেই সুর কেউই জানে না তা। শুধু উপলব্ধি করছিল অন্য এক গভীর ব্যাঞ্জনাময় অনুভূতির অনুরণন। বাজারের চৌহদ্দি ছেড়ে যা বয়ে যাচ্ছিল কোথায় কোন অদৃশ্য গহনে যেন...

Mob. : 9732857327
E-mail : roy.tapas51@gmail.com
TAPAS ROY
LIFE PLANNER
Specialist For
Mutual Fund
(SBI, ICICI, Reliance, UTI ETC)
Term Insurance
Health Insurance

এক ছিল রাজা

মহিবুল আলম

।। এক ।।

উনিশশো সাতানব্বই সালের কথা। জানুয়ারির আট তারিখ আমি নিউজিল্যান্ডের মাটিতে পা রাখি। আমার একমাত্র মামা তখন মাউন্টমাঙ্গানুই শহরে থাকতেন। তাই অকল্যান্ড এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে মামার এক বন্ধুর বাসায় দুপুরের খাবার খেয়ে সরাসরি মাউন্টমাঙ্গানুই শহরে চলে আসি। কিন্তু এক সপ্তাহ পর কী এক কাজে অকল্যান্ড আসতে হয়। অকল্যান্ডের ওয়েস্টার্ণ স্প্রিং-এর মর্নিং সাইডের এক বাসায় উঠি।

আমি যে বাসায় উঠি, সেটা ছিল ব্যাচলরদের বাসা। ওরা দুইজন থাকত। ওদের বাসার কাছাকাছি ওদের পরিচিত এক পরিবার বসবাস করত। স্বামী-স্ত্রী ও চার বছরের ছোট্ট একটি মেয়ে নিয়ে পরিবারটি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বাংলাদেশে ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু নিউজিল্যান্ডে রেজিস্টার্ড ডাক্তার হওয়ার জন্য তখনও তিন পার্ট পরীক্ষা পাশ করে শেষ করতে পারেননি বলে স্বামী-স্ত্রী দুজন অন্য জব করত। এক অর্থে সেই জবকে অড জবও বলা যায়। স্বামী করতেন ক্যাসিনোতে গ্যাম্বলারদের তাস বিলির কাজ। আর স্ত্রী একটা কাপড়ের দোকানে সেলস পারসন।

আসলে গল্পটা সেই দম্পতিকে নিয়ে নয়, তাদের চার বছরের কন্যা সন্তানকে নিয়ে। ছাব্বিশ বছর আগের গল্পতো, তাই সেই কন্যা সন্তানটির নাম এ মুহূর্তে মনে আসছে না। যাক, যেটা বলছিলাম, একদিন এক ব্যাচলরের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে সেই দম্পতির বাসায় যাই। ছোট্ট সেই মিষ্টি মেয়েটাকে দেখে আমি কাছে ডাকি। আদর করে বাংলায় জিজ্ঞেস করি, তুমি কেমন আছ ?

মেয়েটা বাংলাটা ঠিক বুঝতে পারে না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

আমার সঙ্গে যে ব্যাচলর এসেছিল, সে বলে, মেয়েটি বাংলা বুঝে না। বলতেও পারে না।

আমি খানিকটা অবাক হই। ভাবি, বাবা-মা বাংলাদেশী, অথচ মেয়েটা বাংলা বলতে বা বুঝতে পারে না ?

মেয়েটার বাবা তখন কর্মস্থলে ছিল। মেয়েটার মা বাসায়। তিনি লাউঞ্জে আমাদের জন্য চা নিয়ে আসতেই আমি ভূমিকা ছাড়াই জিজ্ঞেস করি, ভাবী, আপনার মেয়ে তো বাংলা বলতে বা বুঝতে পারে না। এটা কিভাবে হলো ?

আমার প্রশ্ন শুনে ভদ্রমহিলা প্রথমে খানিকটা অবাক হন। পরক্ষণ বেশ বিরক্ত হয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করেন, তাতে কি ?

একে তো বাংলাদেশ থেকে সবে এসেছি। মনে ও প্রাণে দেশপ্রেম টগবগ করছে। তাই আমি জোর দিয়ে বলি, তাতে কী মানে ? ওমা, আপনারা বাংলাদেশী। বাংলা আমাদের ভাষা। সেই ভাষাটা মেয়েকে শেখাবেন না ?

ভদ্রমহিলা আমার কথা শুনে চেহারা কালো করে ফেলেন। শালীনতা ধরে রেখেই কঠিন গলায় বলেন, এমন সস্থা আবেগকে প্রশ্রয় যদি দিবেন, তাহলে নিউজ্যিলান্ড এসেছেন কেন ?

আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করি, আমার এই প্রশ্নের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডে আসা না আসার কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

ভদ্রমহিলা জোর গলায় বলেন, এই জন্যই

জিজ্ঞেস করছি, নিউজিল্যান্ড ইংলিশ-স্পিকিং কান্ট্রি। এখানে বাংলা শিখে লাভ কী ? নতুন এসেছেন। ইংরেজিটা ভালোভাবে শিখুন।

আমি এ ব্যাপারে কথা বাড়ানোর প্রয়োজনবোধ না করলেও আস্তে গলায় বলি, ইংরেজিটা শিখেই আমি নিউজিল্যান্ড এসেছি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

।। দুই ।।

বছর দুই পরের ঘটনা। উনিশশো নিরানব্বই সাল। তখন আমি অকল্যান্ডের মাউন্ট ইডেন সাবার্বের ভিউ রোডের জাকারান্ডা লজে থাকি। জাকারান্ডা লজ মূলত দ্বিতল ঘরের পুরোনো মোটেল বা হোটেল ছিল। পরে সেটা ব্যাচলেরদের বসবাসের জন্য বোর্ডিং হাউজ বানায়। ওপর নীচ মিলে মোট চব্বিশটা রুম ছিল। বেশিরভাগ রুম ও ডাইনিং রুম ছিল ওপর তলায়। বড় বড় রুমগুলোতে সিঙ্গেল দম্পতিও বসবাস করত। আমি বসবাস করতাম মাঝারি আকারের রুম নিয়ে নয় নম্বর রুমটায়।

অকল্যান্ডে যারা তখন বাঙালি ব্যাচেলর ছিল, তাদের জন্য জাকারান্ডা লজ বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। জাকারান্ডা লজের চব্বিশটি রুমের মধ্যে তেরটি রুমে বাঙালি ব্যাচলর বসবাস করত। একবার যারা এই লজে ঢুকত. তার আর বের হতে চাইত না। এ জন্য সহজে রুম পাওয়া যেত না। আমি সেই লজে পুরো দুই বছর ছিলাম।

জাকারান্ডা লজের মালিক এত আইরিশ মহিলা। নামটা বেশ সুন্দর ছিল, প্যাম ব্যানেট। বয়স সত্তরের ওপরে হলেও তিনি দেখতে অদ্ভুত সুন্দর ছিলেন। সবসময় খুব সেজেগুজে থাকতেন। ঠোঁটে লাল রঙের টকটকে লিপস্টিক থাকত। খুব হাসতেন তিনি। একসময় লজের সামনে হয়তো বেগুনি রঙের জাকারান্ডা ফুলের গাছ ছিল, তাই লজের নাম জাকারান্ডা রাখা হয়েছিল। আমরা যখন ছিলাম, তখন অবশ্য ফুলের গাছটি ছিল না।

জাকারান্ডা লজের পরিবেশ বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। সাদা চামড়ার ইংরেজ যারা বসবাস করত, তারা নয়টা-পাঁচটা বা শিফটিং ডিউটি করত। বাঙালি যারা ছিল, তাদের বেশিরভাগই ছাত্র ছিল। কেউ ডাক্তারির তিন পার্ট পাশ করে নিইজিল্যান্ডের রেজিস্টার্ড ডাক্তার হওয়ার জন্য দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা লেখাপড়ার ওপর থাকত। কেউ অকল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করত। তাদেরও লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকতে হতো। কেউ কেউ লেখাপড়ার পাশাপাশি পার্টটাইম চাকরি করত। তাই আমরা সবাই চেষ্টা করতাম লজের পুরো পরিবেশটাকে নিরিবিলি রাখার।

কিন্তু একদিন আমি লজের পরিবেশটা পুরোপুরি নিরিবিলি রাখতে পারেনি। সকাল দশটার দিকে স্টেরিওতে দেশাত্মবোধক গান বাজাতে শুরু করি। আসলে সেদিন ছিল অমর একুশে ফেব্রুয়ারী। শহীদ দিবস। স্টেরিওর ভলিউম হয়তো একটু উঁচু ছিল। হয়তো ভেবেছিলাম, সকাল দশটা বাজে। অনেকেই ডিউটিতে। হয়তো আমার ভেতর আবেগটাও একটু বেশি কাজ করছিল।

ঘন্টাখানেকের মতো গান বাজে। হঠাৎ দরজায় করাঘাত শুনি। আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলি। দেখি, আমার পাশের রুম দশ নম্বরের বোর্ডার কবির আহমেদ।

আমি কবির আহমেদকে দেখে সৌজন্যমূলক হাসি দেই। কিন্তু তিনি হাসেন না। তিনি খানিকটা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেন, আপনি এত জোরে গান বাজাচ্ছেন কেন ?

আমি বলি, এত জোরে কোথায় ? খুব বেশি জোরে তো নয়, কবির ভাই ?

- অবশ্যই জোরে। আর যত কম জোরেই বাজান, এতেও আমার ডিস্টার্ব হচ্ছে।

- কবির ভাই, আজ যে একুশে ফেব্রুয়ারী। শহীদ দিবস।

- তাতে কী হয়েছে ?

- একটু আবেগ কাজ করছে। বুঝতেই পারছেন।

- এসব সস্তা আবেগ বাংলাদেশে রেখে আসবেন।

কবির আহমেদের সঙ্গে ব্যাপারটা সেখানে শেষ হলে ভালো হতো। কিন্তু আমার জেদ চেপে যায়। আমি সেদিন স্টেরিওর ভলিউম কমাইনি। তাকে বরং শান্ত গলায় বলি, আপনি আপনার রুমে যান। এটা আমার রুম। আমি যা ইচ্ছে তাই করব।

কবির আহমেদ আমার রুমের সামনে থেকে সরে গিয়ে সরাসরি লজের মালিক মিসেস প্যাম ব্যানেটের কাছে গিয়ে না নয় তা আরও বাড়িয়ে অভিযোগ দেন।

প্যাম ব্যানেট আমার রুমে আসেন। ভদ্র গলায় জিজ্ঞেস করেন, কাজী, তোমার কী হয়েছে ?

আমি পাল্টা জিজ্ঞেস করি, কী হয়েছে, মিসেস ব্যানেট ?

- তোমার পাশের রুমের কবির আহমেদ বেশ অভিযোগ করে এল যে তুমি তাকে ডিস্টার্ব করছ। তোমার রুমে এসেও দেখলাম তুমি গান বাজাচ্ছ।

- আমি কি খুব জোরে গান বাজাচ্ছি ?

- তা নয়। তারপরও। তুমি তো কখনও এভাবে গান বাজাও না।

আমি বোঝানোর ভঙ্গিতে মিসেস প্যাম ব্যানেটকে আমাদের অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর মাহাত্ম্য, ভাষার জন্য শহীদের আত্মদান বুঝিয়ে বলি। তিনি অবাক হয়ে বলেন, ভাষার জন্য এভাবে কেউ শহীদ হয় ?

আমি আবেগের গলায় বলি, জি, মিসেস ব্যানেট। পৃথিবীর একমাত্র দেশ বাংলাদেশ, যেখানে ভাষার জন্য মানুষ শহীদ হয়েছে। আমরা আমাদের ভাষা ফিরে পেয়েছি।

।। তিন ।।

নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বড় বুকস্টোরের নাম ছিল হুইটকোল। এখনও আছে কিনা জানি না। দুই হাজার চৌদ্দ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়া আসার পর কুইন্সল্যান্ডের কোথাও এই নামে বুক স্টোর চোখে পড়েনি।

উনিশশো আটানব্বই সালের মাঝামাঝি। তখন অকল্যান্ডে থাকি। ওয়েস্টার্ণ স্প্রিং সাবার্বের মর্নিং সাইডে এক বাসায় অস্থায়ীভাবে থাকি। তখনও অকল্যান্ডে খুব বেশি বাঙালি চিনি না। যে দুই-চারজন চিনি তারা কাজেকর্মে ব্যস্ত। তাই একেবারেই বাংলা কথা বলা হয় না। এমনিতেই নিউজিল্যান্ডে তখন খুব বেশি বাঙালি ছিল না।

এতদিন হুইটকোল বুক স্টোরে ইংরেজি লেখকের বই ঘেঁটে দেখছি। এমনিই কাজ নেই খই ভাজ। বুক স্টোরের একপাশে ছিল স্টেশনারির কয়েকটি তাক। তাকের একস্থানে ছিল বিভিন্ন বল পয়েন্ট কলম ও ঝনার কলম। আর্ট করার রঙ- বেরঙের পেন্সিলও ছিল অনেক। সাধারণত কলমের কালি বা আর্ট পেন্সিলের রং পরীক্ষা করার জন্য ছোট ছোট সাদা কাগজের প্যাড শেলফে ঝোলানো থাকে। হুইটকোলেও তাই ছিল।

আমি কলমের শেলফের পাশে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা প্যাডের পৃষ্ঠায় দেখলাম, কাঁচা হাতে বাংলায় লেখা -'এক ছিল রাজা'।

খুব সাধারণ একটি লাইন। কিন্তু আমি লেখাটার দিকে খুব মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। আমার কেন জানি মনে হয়েছিল, কতদিন পর যেন আমি বাংলা লেখা দেখছি। বুঝতেই পারছেন, উনিশশো আটানব্বই সালে ইন্টারনেট তেমন ব্যাপকভাবে আসেনি। সবার বাসায় কম্পিউটারও ছিল না। নেটে বাংলা পত্রিকা পড়ার কোনো সুযোগ ছিল না।

আমি লেখাটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেলফ থেকে একটা কলম নিয়ে লেখাটির নিচে লিখি, 'তার ছিল দুই রানি। সুয়োরানি ও দুয়োরানি ....!'

ঈর্ষা

অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

পয়লা বৈশাখ। বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের অন্তর্গত একটি অন্যতম উৎসব। পাঁচ বছরের শিশু পুত্রটিকে বিকেলে ডাক্তার দেখানোর পরে স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে মহাবীর এনক্লেভের একটি গলির রাস্তা ধরে এগোচ্ছিলাম কালীবাড়ির উদ্দেশ্যে। আমি যত নাস্তিকই হই না কেন বৎসরকার দিনে জীবনসঙ্গিনী স্ত্রীর ওই সামান্য অনুরোধটুকু উপেক্ষা করা যায়নি। চলতে চলতে রূপালী আমার কাঁধে আলতো ভাবে একটি ধাক্কা দিয়ে বললে– তুমি, সত্যিই খুব বেরসিক গো।

কথাটা হজম করতে না পেরে অবাক বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করি - একথা বলছো কেন ? আমার অপরাধ ?

রূপালী অনুযোগের সুরে বললে- রাস্তায় কি ভাবে বৌয়ের সঙ্গে চলতে হয় এখনো শেখোনি। সামনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। তাহলেই বুঝবে - 'সখী, ভালোবাসা কারে কয় ? সেকি কেবলই যাতনা ময় ?

রূপালীর কথা মতো সন্ধানী চোখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে যাদের দেখলাম তাঁরা আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচিত না হোক আমি তাঁদের চিনি। দুজনেই 'সিনিয়র সিটিজেন'। পরন্ত বিকেলেও ভদ্রলোকের চোখে কালো চশমা। নিশ্চিন্ত নীরবে ভদ্রলোকটি তাঁর স্ত্রীর কাঁধে বাঁ-হাতটি রেখে পরম আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ছন্দবদ্ধ পায়ে বাড়ি ফিরছেন। বোধহয় কালীবাড়ি হয়ে।

ওরা দৃষ্টির অগোচরে চলে যেতেই রূপালীকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বললাম - ঈর্ষা করো না। আমার চোখেও হাই পাওয়ারের চশমা। রাতের বেলায় বৃষ্টি-কাঁদার দিনে রাস্তায় চলতে আমারও অসুবিধে হয়। ভগবান না করুন, আমায় যেন তোমার কাঁধে হাত রেখে চলতে না হয় কোনদিন। ভদ্রলোকটি অন্ধ। এককালে স্কুল মাস্টার ছিলেন। ছাত্রদের ইংরেজি পড়াতেন। রূপালী লজ্জায় সংকোচে কুঁকড়ে গিয়ে জিভ কেটে বললে- ও মাই গড্।

মোবাইল নম্বর ঃ ৯৯৩৩৯৮৬১৬৬
৭৪৭৮৯৭০২৯৫

ওঙ্কার জুয়েলারী ওয়ার্কস্

প্রোঃ শৈলেন পাল

হলমার্ক সোনা ও চাঁদি রূপার গহনা প্রস্তুত কারক ও
অর্ডার অনুযায়ী সাপ্লাই
ও যত্ন সহকারে মেরামত করা হয়

পালবাড়ী ঃঃ পশ্চিম মেদিনীপুর

মতিনের মা

নীলাঞ্জনা চক্রবর্তী

(১)

আর একটু, আর একটু, হ্যাঁ হয়েছে। হয়ে এসেছে - ব্যস ভোকাট্টা। মিস্ত্রি পাড়ার বাবানের লাল হলুদ ঘুড়িটা ঘ্যাচাং ফু। লাটাই সাহেবের হাতে দিয়ে মতিন ছুট লাগিয়েছে। এঁকে বেঁকে তীব্র গতিতে ছুটছে। এদিকে বড় বড় ফোটায় শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি। ঘুড়ি টা লাটিমদের করবী গাছে আটকেছে। মনা আর রবি মতিন কে পেরিয়ে এগিয়ে গেল ছুটে। মনা লাফাচ্ছে। এই এই ঘুড়ির নাগাল পেয়ে গেল বলে! মতিন দিগ্বিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটছে। রোগা টিংটিং শরীরটা যেন ফড়িং এর মত উড়ছে। হঠাৎ ওর ছোট হালকা শরীরটা সত্যি সত্যি উড়ে ছিটকে পড়লো লাল রাস্তার ধারে প্রায় বুজে আসা নালাটার পাশে। মোটরসাইকেল আরোহী হেলমেটের কাঁচের ভিতর দিয়ে একবার মতিনের পড়ে থাকা দেহটার দিকে দেখল। আর দেখল হৈ হৈ করে ছুটে আসা আশেপাশের দোকান আর ঘরবাড়ি থেকে ধেয়ে আসা লোকজনদের দিকে। তারপর ফুল স্পিডে সোজা বেরিয়ে গেল আর কোন দিকে না তাকিয়ে।

(২)

চামেলির হাতে নীল চুড়ির গোছা ঠিনঠিন করে বাজছে। সাত বছরের পুরনো অ্যালুমিনিয়ামের কড়া তার হাতের সাবান মাখানো ছোবড়ার ঘষা খেয়ে রুপোর মতো ঝকঝক করছে। চামেলির হাত আর মুখ দুটোই সমান তালে চলছে। আপন মনে বকবক করছে সে। কি জানি ছেলেটা ঘরে আছে নাকি জ্বর গায়ে আবার ঘুড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। দিন দিন রোগা হয়ে যেন ডিং ডিং করছে। একটা কথা যদি শোনে। বাপ-মা এতোটুকু দুধের শিশুকে ফেলে দিয়ে পালালো। কি নিদয় মানুষ। আমি এই বাচ্চার ভয়েই বিয়ে করলাম নাকো, আর আমার ঘাড়ে এই ঝামেলায় এসে জুটলো। চামেলি সিঙ্কে বাসন মাজছে আর

পাশেই রান্নার মেয়ে মাধুরী মাছ কুটছে। সে বলল - ও চামেলিদি তাহলে তুমি বাচ্চার ভয়ে বিয়ে করোনি? চামেলি উৎসুক স্রোতা পেয়ে বলতে লাগল - হ্যাঁরে ভাই, আমি তখন অনেক ছোট, দশ বারো বছর হবে হয়তো, তখন আমার এক পিসির মেয়ে দিদি কে দেখেছি - দিদিটার বেশ মাইক বাজিয়ে ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছিল। কিছুদিন পর একটা দেড় বছরের বাচ্চা কোলে আর একটা পেটে- সে বৈশাখ মাসের কাঠ ফাটা রোদ মাথায় করে পিসির বাড়িতে মানে তার মায়ের কাছে ফিরে এলো। বরের মারে গালে কপালে কালসিটে, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, কোলের বাচ্চাটা কাঁদছিলো আর পেটেরটা মরে গেছল পেটেই। বিয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। দিদিটা এখন দর্জি দোকানে কাজ করে ছেলেটাকে মানুষ করছে। ওর অবস্থা দেখে আমার তো হয়ে গেছে। আর আমার মেজদিদিটা বাচ্চা হতে গিয়ে মরেই গেল। আমি ওইসব দেখে তাই ভেবেই নিয়েছিলাম বিয়ে আর বাচ্চায় আমি নেই। বরের হাতে মার খেতেও পারবো না আর বাচ্চা হওয়ার ব্যথা, বাচ্চা মানুষ করার ঝক্কি নিতেও পারবো না। এই বেশ আছি। যতদিন

গতর চলছে খাটবো খাবো। কিন্তু ওই কথায় বলে না - "কপালে থাকলে গু কাকে এনে দেয়" সেই বাচ্চা মানুষের দায়িত্ব এসে পড়লো ঘাড়ে। মাধুরী বলল মতিন তোমার তাহলে কে হয় ? আর কে হয়! বলতে গেলে ওই আমার সব হয়, আর না বললে ও আমার কেউই হয় না। আমাদের পাশের বাড়িতে মতিনের বাপ মা ভাড়া থাকতো। মতিন যখন পাঁচ মাসের পেটে তখন ওরা ওই বাড়িতে ভাড়া এল। তারপর মতিন হল। ওর বাপ কোন্ কারখানায় কাজ করতো। তবে মাঝে মাঝে খরচাপাতি দিত না ঘরে। ঘরে আসতও না দিনের পর দিন। মতিনের বয়স যখন এই মাস আষ্টেক হবে তখন ওর মা ঝুমা আয়ার কাজ ধরল। না ধরে উপায় নেই, খাবে কি ? ছেলেকেই বা খাওয়াবে কোথা থেকে ? ঝুমা আমার হাতে ধরে বলল মাসি তোমার ভরসায় কাজটা ধরলাম। নাইট ডিউটি, সন্ধ্যে সাতটা থেকে সকাল সাতটা। মতিন তো রাতে ঘুমিয়েই থাকবে, তুমি একটু ওকে দেখে রেখো। জলভরা চোখে আমার হাত দুটো ধরে এমন ভাবে বলল যে আমি আর না বলতে পারলাম না। এইভাবে মাস কতক চলল। তারপর একদিন সকালে ঝুমা আর ফিরলো না। মতিনের বাপ তো ঘরে আসা ছেড়েই দিয়েছে। বাপ মা দুজনেই বাচ্চাটাকে ছেড়ে পালালো। আমি এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে জানলাম ঝুমা কোন ড্রাইভার এর সঙ্গে দিল্লি না ভোপাল কোথায় যেন পালিয়েছে। আর ওর বাপ যে কারখানায় কাজ করতো সেখানে আরো একটা বিয়ে করে সংসার পেতে বসে আছে, আমি তবু তার কাছে গিয়ে বললাম তোমার ছেলেকে নাও। সে বলল আমি আবার বিয়ে করেছি। ওই রকম কত ছেলে আমার চাইলেই হবে। ওকে আমি আর নিতে চাই না। তুমি রাখলে রাখো, ফেলে দিলে ফেলে দাও। মাধুরী গালে হাত দিয়ে বলল - ও মা। এ আবার কি ধরনের কথা ? চামেলি বলে হ্যাঁ আমিও এই বলেছিলাম, তখন সে বলল আমি ওর বাপ কি না তার কি ঠিক আছে ? ওর মায়ের স্বভাব চরিত্র ভালো ছিল না।ওকে এখান থেকে নিয়ে বিদায় হও। ব্যাস তখন থেকে ছেলে আমার কাছেই আছে। আমিই ওর বাপ। আমিই ওর মা। লোকের ঘরে দিনরাত খেটে মরছি ওই ওর জন্যই। ওর পড়া লেখার খরচ, এটা চাই, ওটা চাই, কত রকম বায়না - আমি সব সামলাই। মতিন আমায় কি বলে ডাকে জানিস ? আমাকে বলে চামি। আমাকে সবাই চামেলি বলে তো, সেই শুনে শুনে ঐ ডাক। তবে বাবুসোনার আমার বুদ্ধি আছে, গড় গড় করে বই পড়তে পারে, ইংরেজি লেখাও পড়ে দেয়। চার কেলাস পড়েছে। ওকে আমি অনেক পড়াবো। যত পড়তে চায় ততই পড়াবো। ছেলে আমার যেন সুস্থ থাকে - উপরওয়ালার কাছে সব সময় এই প্রার্থনা করি। এত দুরন্ত জানিস রে মাধুরী, একটা ঘন্টা ঘরে থাকবে না। যতক্ষণ জেগে আছে ততক্ষণ হয় ঘুড়ি, নয় গুলি, না হলে সাইকেল, না হলে পেয়ারা গাছে উঠে বসে আছে। এইসবই হচ্ছে। ওর কথা ভেবে ভেবে সবসময় আমার বুকটা দুরু দুরু করতে থাকে। মাধুরী বলে অত ভেবোনা তো চামেলিদি, তুমি পরের ছেলের জন্য যা করছ তা আর কেউ করবে না। যাদের পয়সা আছে, লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক, তারা নিজেদের বাচ্চা ছাড়া আর কারোর দিকেই ফিরে তাকায় না। সেখানে তুমি খেটে খাওয়া মুখ্য মানুষ হয়ে এত করছ সে কি উপরওয়ালা দেখছে না ? দেখবে তোমার মতিন অনেক বড় মানুষ হবে। মাধুরীর মুখের কথা শেষ হলো কি হলো না বাইরে থেকে বেশ কয়েকজনের সমবেত চিৎকার ভেসে এলো। ও চামেলী মাসি তাড়াতাড়ি চলো। তোমার মতিন এর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

(৩)

মতিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। তার বাম পায়ে প্লাস্টার। মাথায় ব্যান্ডেজ। হাতে স্যালাইন চলছে। চামেলি তার বেডের পাশে একটা টুলে বসে বেদানা ছাড়াচ্ছে। নার্স দিদিমণি এসে মতিন কে দেখে স্যালাইনটা বদলে দিলেন। চামেলীকে বললেন এই যে মতিনের মা, তোমার ছেলেকে কাল রিলিজ করে দেয়া হবে। এরপর থেকে একটু চোখে চোখে রাখবে ছেলেটাকে। যা কান্ড করেছিল নেহাতই ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছে। চামেলি দুহাত জড়ো করে নার্স দিদিমণির

দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তার ঠোঁট তির তির করে কাঁপছে। অনর্গল বকবক করা চামেলীর মুখ দিয়ে কথা সরছে না। তার কানে অবিরাম বেজে চলেছে "ও মতীনের মা" ও মতিনের মা"...। চামেলীর কানে যেন সুধাবর্ষণ হচ্ছে- চামেলীর মন ভরে যাচ্ছে। প্রাণ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। দুচোখ ছাপিয়ে গাল ভাসিয়ে দিচ্ছে আনন্দাশ্রু। মতিন ঘুমের ঘোরে ছটফট করছে। একবার চোখ খুলে ডেকে উঠল "মা মাগো!" চামেলি ওর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে উঠল - এই তো আমি, বাবুসোনা আমার। চামেলীর মুখের দিকে চেয়ে মতিন শান্ত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞানবিভাগ ছাত্রছাত্রীদের

D.PHARM

পড়ার সুবর্ণ সুযোগ

- পাস করে চাকরি করা যাবে।
- ঔষধ দোকানও করা যাবে।

SESSION - 2024 - 26

যোগ্যতা ঃ **D. Pharm** কোর্সে ভর্তি হতে গেলে উচ্চমাধ্যমিকে সায়েন্স বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে। উচ্চমাধ্যমিকে **Physics** এবং **Chemistry** অতি অবশ্যই থাকতে হবে সঙ্গে **Mathematics** অথবা **Biology** যেকোন একটি থাকলেই হবে।

Duration
2 Years

পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের কাছ থেকেই **B.Pharm, M.Pharm,** কোর্স করে, কোর্স শেষে উচ্চ বেতনে এবং উচ্চ সম্মানে ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানীতে কাজ করার সুযোগ পাবেন।

HURRY!
Limited Seats

Facility : Student Credit Card Loan, Various Govt. Scholarship, wi-fi Enabled Campus, উন্নত মানের Laboratory, Smart Class Room, ICT Enabled Class Room & Library

Attendance & Exam Support • Complete PCI Registration

College Address

Rishi Aurobindo Institute Pharmacy College

Recognized By : Pharmacy Council of India
Affiliated to : West Bengal State Council of Technical & Vocational and Skill Development (Technical Education)
Vill + P.O. - Panchkhuri, P.S.- Kotwali
Dist.- Paschim Medinipur, Pin - 721150

Lalita Barik Memorial Institute Pharmacy College

Recognized By : Pharmacy Council of India
Affiliated to : West Bengal State Council of Technical & Vocational and Skill Development (Technical Education)
Vill + P.O. - Panchkhuri, P.S.- Kotwali
Dist.- Paschim Medinipur, Pin - 721150

Contact No 9933722796, 7001750735, 9830249999, 9434341327, 8918512166

Reg. Office Address B-7, Aurobindo Nagar Judges' Court Road Midnapore Paschim Medinipur Pin - 721101

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী"

দেবাশিস খাটুয়া

নিশুতি রাতে ফিরেছিল সে। আগুন তখন নিভু নিভু। শুধু ধোঁওয়া। কালো কালো ধোঁওয়া। কোথাও বা উঠছে কুন্ডলী পাকিয়ে। চারিদিকে পোড়া পোড়া গন্ধ। সবই প্রায় পুড়ে ছাই। খড়ের চাল, বাঁশের দরজা, জানালায় ঝোলানো চট, ছেঁড়া মাদুর – কিছুই নেই আর। শুধু মোটা দেওয়াল দাঁড়িয়ে আছে কোনরকমে। পাল্টে গেছে মেটে রঙ। কালো, ঝিম কালো রঙ ধরেছে তাতে।

ইতি-উতি চায় সে। অন্ধকারে ঠাহর করা মুশকিল। তবু খুঁজে চলে। কোথায় গেল ? তার একমাত্র ভালোবাসা আর আদরের ধন। বিকলাঙ্গ এক মেয়ে। বৌ তো চলে গেছে কবেই। নিকা করেছে নতুন করে। বাধা দেয়নি সে । মানে দিতে পারে নি। একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। তার সাথে থাকলে হয়তো খাওয়াই জুটত না। জমি জিরেত নেই। কোমরে চোট লাগার পর কাজও জোটে না তেমন। রোজগার নেই। জমানো টাকা নেই। জীর্ণ এক কুঁড়েতে কোনরকমে থাকা। এমন খসমের সাথে কে-ই বা ঘর করতে চায়।

দূর, এসব কথা আসছে কেন মাথায়। এখন তো তার বিপদ। ঘোর বিপদ। কে বা কারা আগুন লাগিয়েছে তার ঘরে। না, ঠিক তার ঘরে নয়। লাগিয়েছে দূরে। বেশ কয়েক ঘর পরে। কিন্তু আগুন কি থেমে থাকে এক জায়গায় ? ছড়িয়ে পড়েছে। বিস্তার করেছে লোল জিহ্বা, লেলিহান শিখায় জ্বলেছে তার খড়ের চাল। কেউ নেভায় নি। নেভনোর চেষ্টা করেনি। ঘাতকরা ছিল আশে পাশেই। কাউকে ঘেঁষতে দেয়নি কাছে। তেড়ে গেছে কুড়ুল কিংবা টাঙ্গি নিয়ে। মেতেছে উন্মত্ত জিঘাংসায়।

কিন্তু তার অপরাধটা কী ? সে তো কারো সাতে পাঁচে থাকে না। নিরীহ দিন মজুর এক। নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। কোমরে জোর নেই। আগের মত খাটতে পারে না। অল্পেতেই হাঁফ ধরে। ক'দিন তো কাজই ছিল না কোনো। কাজের খোঁজে গিয়েছিল দূরে। শহরের বাজারে। পেয়েও ছিল কাজ। রাজমিস্ত্রির জোগাড়ে।

মজুরীর সবটা অবশ্য পায়নি। কিছু দিতে হয়েছে হেড মিস্ত্রিকে। এটাই নাকি দস্তুর। তা হোক, কিছুতো পেয়েছে। মনটা খুশি খুশিই ছিল। চাল ডাল কিনেছিল। কিনেছিল মেয়ের জন্য লজেন্স। পা চালিয়ে এসেছিল বাসস্টপে। শেষ বাসটা ধরতেই হবে। কিন্তু কপাল খারাপ। বাস এল না। রাস্তায় খারাপ হয়েছে। নাকি বাসই ছাড়ে নি। হয়তো তেমন প্যাসেঞ্জার পায়নি। পেট্রোল-ডিজেলের যা দাম। দেখেছে পোষাবে না। মাঝখান থেকে সে পড়ল মুশকিলে। অপেক্ষাই সার। অগত্যা কী আর করা। হেঁটেই রওনা দিল। মেয়েটা যে তারই পথ চেয়ে। কতই বা বয়েস। নয় কি দশ বড়জোর। একটা পা নুলো। পা টেনে টেনে চলে। কষ্ট হয়। তবুও চলার শখ। হয়তো দৌড়তে চায়। কিন্তু পারে কই। বাধা যে অলঙ্ঘ্য। বাঁকানো একটা লাঠি আছে। কিনে দিয়েছিল সে গঞ্জের বাজার থেকে। তাতে ভর দিলে কষ্ট কিছু কমে। প্রায়-ই সেভাবেই চলে।

না, আর পারা যায় না। গন্ধ, তীব্র কটু গন্ধ। কত কিছু পুড়েছে যে। কিন্তু একটা গন্ধ যেন বড় বেশি উগ্র। চামড়া পোড়ার গন্ধ। তবে কি ? উঃ কি সাংঘাতিক। না না, তা কেন হবে। নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয় সে। বুকের ধুকপুকি কিন্তু বেড়ে গেছে। মনে আতঙ্ক দানা বাঁধছে। কোমর থেকে গামছাটা খুলে নেয়। নাকে-মুখে চাপা দেয়। চোখ জ্বলছে। এখনো তাপ যথেষ্ট। তাছাড়া, ধোঁয়াও

আছে।

ইতস্তত চায় সে। বড় অসহায় অসহায় লাগে। তবুও আশায় বুক বাঁধে। পাশের ঘরে ঢোকে। ছোট্ট এক রান্নাঘর। সরঞ্জাম অতি সামান্য। পাতা উনুন। হাঁড়ি-কড়াই। আর দু'চারটে থালা-বাটি। পোড়ানোর নেই বিশেষ কিছু। তাই হয়তো এখানে তাপ কম। ধোঁয়াও নেই তেমন। আগুন না থাকায় অন্ধকার এখানে গাঢ়তা পেয়েছে। কিছুই প্রায় দেখা যায় না। আন্দাজে পা বাড়ায় সে। কি যেন ঠেকে পায়ে। আরে! এ তো মেয়ের সেই লাঠি। নীচু হয় সে। হাতে তুলে নেয় লাঠিটি।

হঠাৎ কি যেন এসে পায়ের ওপর পড়ে। ভীষণ চমকে ওঠে। বুক ধড়াস ধড়াস করে। কী ও ? কে ও ? অন্ধকারে ঠিক ঠাহর হয় না। শুধু আঁচ পায় কে যেন জড়িয়ে ধরেছে তার পা। ভয় পায় সে। আতঙ্ক গ্রাস করে। চেঁচিয়ে উঠতে চায় কে বলে। পারে না। গলা দিয়ে বিকৃত স্বর বেরয়। কি করবে ভেবে পায় না। ততক্ষণে কানে আসে এক আর্ত স্বর। নারীকণ্ঠের আর্তি ঃ "মেরো না, মেরো না আমাকে, পেটে বাচ্চা।"

একটু যেন ধাতস্থ হয় সে। সম্বিত ফেরে। গলাটা যেন চেনা চেনা। রাবেয়া না ? কিন্তু এখানে কেন ? তার সাথে তো সম্পর্ক চুকে বুকে গেছে সেই কবেই। সে তো এখন মন্নু শেখের বিবি। মন্নু হাড্ডা-গোড্ডা, ডাকাবুকো। পয়সাও আছে বেশ। হবে না-ই বা কেন। একসময় লাল্লু শোখর সাগরেদ ছিল। এখন অবশ্য পাল্টি গ্রুপে। লাল্লু ছিল এ তল্লাটের মাথা। শাসক পার্টির নেতা। প্রচন্ড দাপট তার। পাঁচ গাঁয়ের লোক মানে তাকে। মানে মানতে বাধ্য হয়। না মেনে উপায় নেই, সরকারী রেশন, ভান্ডার-টান্ডার সবেতেই তার হাত আছে। গাঁয়ের মুখ্যু-সুখ্যু লোক এসব বিশেষ বোঝে না। তারা জানে লাল্লুর কৃপা থাকলেই এসব পাওয়া যায়। লাল্লুকে অবশ্য ভাগ দিতে হয়। এটাই এখানকার দস্তুর। তা নিয়ে অবশ্য তেমন কেউ মাথা ঘামায় না। ঘামিয়ে লাভ-ই বা কি। লাল্লুর সাথে কে লাগবে। এ তো যেন জলে বাস করে কুমীরের সাথে ঝগড়া করা। দরকার কি বাপু। যা পাচ্ছি তা-ই সই। বেশি ট্যাঁফো করলে সেটুকুও বন্ধ হয়ে যাবে। চাই-কি ঘরও জ্বলতে পারে। কিংবা গুম-খুন, লাল্লু তো আর হেঁজিপেঁজি নয়। বিশাল ক্ষমতা তার। বালি খাদান, পাথর পাচার সবেতেই তার অংশ আছে। থানাতেও তার খাতির। পুলিশের সাথে তার দহরম-মহরম। অনেকেই তার বশ। কে দুষ্মনি করবে তার সাথে। দল-বল নিয়ে লাল্লু চড়াও হলে আর রেহাই নেই।

এ হেন লাল্লু কিন্তু একদিন খুন হায় গেল। কারা যেন বোমা মেরেছে তার ওপর। কয়েকদিন ধরেই গোলমাল চলছিল। কারা যেন ঘোঁট পাকাচ্ছিল। মাথা-চাড়া দিচ্ছিল লাল্লুর বিরুদ্ধে। লাল্লুর বাড়ী-গাড়ি। বিলাসী জীবন-যাপন অনেকের চোখে জ্বালা ধরাচ্ছিল। পার্টির ওপর তলার নালিশ জানিয়ে কোন ফল হয়নি। সেখানেও লাল্লুর লম্বা হাত। আপসে রাজী নয় লাল্লু। ভাগ ছাড়তে নারাজ। খাদান, পাচার, তোলাবাজির বেশির ভাগ রসই সে নিঙড়ে নিতে চায়। কিন্তু বেশিদিন এভাবে চলবে কেন। পাল্টি গ্রুপ মাথা তুলল। আর হঠাৎ নিকেশ হয়ে গেল দাপুটে লাল্লু শেখ। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল লাল্লুর সাঙ্গপাঙ্গরা। প্রতিশোধের উগ্রতায় মেতে উঠল জান্তুর জিঘাংসায়।

"মিঞা!" ভয়ানক চমকে ওঠে সে। কী করবে ভেবে পায় না। বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কাঁপা কাঁপা স্বরে ভেসে আসে কথা -কটি ঃ

"আমার কসুর হয়তো ছিল। কিন্তু বিশ্বাস কর। নিকাতে আমার মত ছিল না। এটা মন্নুর জলরদস্তি। ভয় দেখিয়েছে নিকা না করলে আমাকে নিকেশ করবে। তোমাকে, এমনকি মেয়েটাকেও রেহাই দিবে না। আমি সুখে ছিলাম না মিঞা। কতবার ভাবছি, গলায় দড়ি দিব, নাইলে গলায় কলসি বেঁধে ডুব মারব। কিন্তু ততদিনে পেটে বাচ্চা। মহাপাপ হবে যে। লোকটাকে ওরা খুন করেছে। ঘরে আগুন দিচ্ছে। আমি খিড়কি দিয়ে পলাই আসছি। আমাকে ঠাঁই দেও মিঞা।"

এসব কথায় মন নেই তার। অন্ধকার ততক্ষণে চোখ সওয়া। এদিক-ওদিক চায়। হঠাৎ ছ্যাৎ করে ওঠে

বুক। পা দুটো কাঁপতে থাকে। কী, কী ওটা ? কী পড়ে আছে উনুনের পাশে ? কালো, নিকষ কালো। ধপ্ করে বসে পড়ে সে। হামা দিয়ে এগিয়ে যায় কাছে। ডান হাতে তামার চুড়িটাও কালো হয়ে গেছে। কে যেন বলেছিল, তামার চুড়ি পরলে নাকি গায়ে পায়ে জোর আসবে। ঠিক বিশ্বাস হয়নি। তবে ফেলতেও পারেনি কথাটা। টাকা জমিয়ে কিনে দিয়েছিল। মেয়ে খুব খুশি। আর যাই হোক, গহনা তো একটা। বাপকে চুমো খেয়েছিল। বুক ভরে গিয়েছিল বাবার।

কিন্তু আজ ? এখন ? ডুকার কেঁদে ওঠে সে। হাত বাড়িয়ে ধরতে চায় পোড়া মাংস-পিন্ড। পারে না। তপ্ত, গলিত, বীভৎস। আল্লা! এ কি শাস্তি। কী কসুর ওর ?নিরীহ পঙ্গু শিশু এক। দগ্ধে দগ্ধে মরেছে। ওঃ কী যন্ত্রনা! কার, কার পাপের ফল এটা ?

নাক-মুখ থেকে গামছা সরায় সে। ঢাকে মেয়ের শরীর, তার আদরের ধন। বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। সে চলে গেছে। অকালে ঝরে গেছে। আর কি জন্য বাঁচা। জীবন এখন অর্থহীন। নতুন করে ঘর বাঁধা আর না। বুকে চেপে ধরে সে মেয়ের তপ্ত শরীর। উঠে দাঁড়ায়। বেরিয়ে আসে পোড়া ঘর হোক। দৌড়তে থাকে। জোরে, আরো জোরে। গন্তব্য জলাশয়। জুড়াতে চায় দহন জ্বালা। রাত্রির ঘন কালো আঁধারে সে যেন মিলিয়ে যায় ক্রমে।

লেখকের কথা ঃ "কল্পনা-আশ্রিত হলেও সাম্প্রতিক অতীতের এক সত্য ঘটনার অংশ-বিশেষ এ গল্পে প্রতিবিম্বিত। অমানবিকতা ও পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে, সাহিত্যের আঙ্গিকে এ-ও এক প্রতিবাদ-প্রয়াস। ঘটনাটি বিচারাধীন বলে নামোল্লেখ থেকে বিরত থাকলাম।"

এখন ভয় করে

নিমাই সিং

না রে না, তেমন কোন ব্যাপার না। সবুজ সবুজ গাছপালা বনজঙ্গল আমার খুব ভালো লাগে। তবে বর্তমানে জঙ্গলে ঢুকতে আমার ভয় করে। একটা সময় ছিল, হয়তো বা না জেনে না বুঝে অনেক সময় মনের আনন্দে বনজঙ্গলে ঢুকার চেষ্টা করেছি আবার কখনো কখনো ঢুকেছি। বনের ভিতর খড়র খড়র শব্দ শুনে ভয়ে দৌড়ে বেরিয়েছি। পরে জানলাম গরু মহিষের গলায় বাঁধা একরকম শুকনো কাঠের ঘন্টা। ঘাড় নাড়লেই শব্দ হয়। বাগালরা বুঝতে পারে গরু মহিষরা কোথায় কোথায় আছে। মামা বাড়িতে গেলে কখনো কখনো দাদাদের সাথে শালপাতা, কেঁদুপাতা তুলতে গিয়ে বড় বড় কুকুরের মতো শিয়াল দেখেছি বনের ধারে। হাতে পাথর নিয়ে তাড়া করেছি। আমাদের ছোঁড়া পাথরের ভয়ে ওরা দৌড়ে পালায় নি। আমাদের দিকে দেখে দেখে হেলে দুলে বনে চলে যায়। দেখে মনে হচ্ছিল একা থাকলে আমাকেই আক্রমন করে বসত। আরও একবার, মনে পড়ে এক সকালে মামার গ্রামে জঙ্গল ধারে বাঘ মারা নিজের চোখে দেখেছি। মামার পাড়ার বিক্রমদার সঙ্গে বাঘের হাতাহাতি লড়াই ও দেখেছি। তখন ভয় পাওয়ার মতো কিছু ঘটনা দেখলেও মনে অত ভয় পেতাম না। কিন্তু এখন বনের নানা গল্প শুনে অতীত কথা মনে হলে বনের ভিতরে যেতে ভয় পায়। বিশেষ করে রাতে তো থাকতেই পারবো না জঙ্গল ঘেষা গ্রামে, তাছাড়া এখনতো জঙ্গলমহল এলাকার যা খবর টিভি ও পেপারে দেখি শুনি তা অত্যন্ত ভয়ংকর। যেভাবে হাতিরা দল বেঁধে জঙ্গল ছেড়ে গ্রামগুলোতে ঢুকে ফসল নষ্ট করে। ঘরবাড়ি ভাঙ্গে, শুনেছি মানুষ ও মারে। মনেপড়ে এক বুনো হাতির ভয়ংকর গল্প। অনেকদিন আগের কথা, আমার অফিসের এক বন্ধু জঙ্গল মহলে গড়বেতার ঐদিকে থাকে। একদিন বনের জীবজন্তুর কথা বলতে গিয়ে বলে বর্তমানে হাতির জ্বালায় দিনরাত বলতে গেলে সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকি। কখন যে কার কপালে

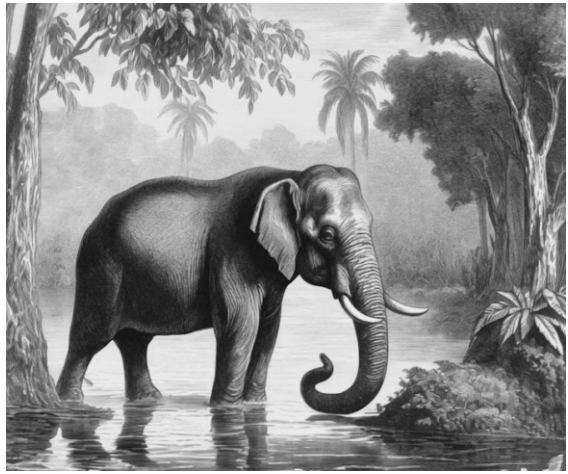

কী ঘটে বলা মুসকিল। কখনো কখনো অস্বাভাবিক এমন কিছু হাড় হিম করা ঘটনা ঘটে যা মনে দাগ কেটে যায়। ওর চোখের সামনে ঘটে যাওয়া এক ঘটনার কথা বলে, বলে একদিন বিকেলে বনের ধারে হাটে বাজার করে দুই বন্ধু সাইকেলে বাড়ি ফিরছি। আমাদের আগে আগে অনুমান ৬০ / ৭০ ফুট দূরে একজন কেউ যাচ্ছিল সাইকেলে চড়ে। হঠাৎ দেখি লোকটা সাইকেল থেকে পড়ে যায়। তারপর দেখি ওর সামনে একটা হাতি, তারপর হাতিটা যা কান্ড করল ভাবা যায় না। লোকটা পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে নি। হাতিটা লোকটাকে শুঁড়ে ধরে আছাড় দিয়ে মেরে রাস্তার ধারে রেখে বনের থেকে কিছু কাঠ, ডালপালা এনে লোকটার উপর চাপা দেয় এবং জঙ্গল ঘেষা গ্রামের দিকে চলে যায়। ভাবতে পারছি না কী করব। কেউ কেউ বলে কেউ আগে যাবে না। যা ঘটার ঘটে গেছে। যদি হাতির সাথীরা কাছাকাছি থাকে বিপদে পড়বে। তাছাড়া হাতিটা বনের ভিতর না গিয়ে গ্রামের দিকে গেল কেন। এমন ঘটনাতো আগে কখন দেখিনি। আজ হঠাৎ কেন এমন ঘটছে। দূরে দাঁড়িয়ে আমরা যখন নানা কথা আলোচনা করছি, এমন সময় দেখি হাতিটা একটা জলন্ত কাঠ নিয়ে এসে ডালপালায় ঢাকা ঐ মৃত লোকটির উপর রেখে গভীর বনে চলে গেল।

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছে। জঙ্গলে এমন সব ঘটনা যখন তখন ঘটে থাকে, ঐ ঘটনার কথা আমিও শুনেছি ঐ এলাকার এক আত্মীয়ের কাছে। তবে এটাকে বাস ট্রেন টেক্সি মটর সাইকেল নৌকার মতো এক্সিডেন্টই মনে করি। বাস, ট্রেন দুর্ঘটনা হয় সবাই জানি তবুও যেমন বাস ট্রেনে চড়া বন্ধ করি না, তেমনি বনে জন্তু জানোয়ার হামলা হলেও কেউ বন জঙ্গল, ঘর দুয়ার ছেড়ে পালিয়েছে মনে হয় না। তবে এটা স্বীকার করি জঙ্গল এলাকার সব জায়গাতে এমন ঘটনা ঘটে তা কিন্তু নয়। আমাদের এলাকার কারো কারো ফসল বা ঘরবাড়ি মানে ছোট ছোট ঝুপড়ি ঘর অবশ্যই ভাঙ্গে যদি মনে করে ঐ ঘরের মধ্যে কোন খাবার আছে। তবে মাঠের চাষ প্রায় নষ্ট করে।

– কখনো তোদের ফসল বা ঘর ভেঙ্গেছে ?

– না। রাতে আমাদের গ্রামে হাতি অবশ্যই আসে অনেকের ক্ষতি করে আমাদের ঘরেও রাতে আসে কিন্তু এখন ও পর্যন্ত তেমন কোন ক্ষতি করেনি। আমাদের পরিবারে ধান, সবজিও ফল ফুলের চাষ হয়। খোলা মাঠে সেলো পাম্পের জলে চাষ হয়। কোনো ঘেরা বা বেড়া নেই। হাতির খাওয়ার মতো অনেক জিনিস আছে। খামারে পড়ে থাকে। আমাদের ফলফুল ও সবজির বাগান আছে, সেই সঙ্গে ফল ফুল সবজির ব্যবসাও আছে। হাতি রাতে আসে কিন্তু কোনো ক্ষতি বা নষ্ট করেনা, খায়ও না।

– তবে কিসের জন্য আসে ?

– আমাদের এলাকায় জঙ্গল তো আছে কিন্তু জলের খুব অভাব বিশেষ করে বর্ষাকাল ছাড়া। তাই ওরা রাতে আসে জলের খোঁজে। আমাদের ঘরে সিমেন্টের বড় বড় তাড় আছে। ধান ভেজানোর জন্য ঐ তাড়ে জল রাখা থাকে। হাতি রাতে আসে জল খেয়ে চলে যায়। কোনো কিছুই নষ্ট করেনা। আমার অভিজ্ঞতায় যা দেখেছি শুনেছি এবং বুঝেছি হাতির সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার কিংবা গালাগালি না করলে সহসা কারো ক্ষতি করে না। তবে একেবারে যে কোনো ক্ষতি করে না তা নয়। বন থেকে রাতে গ্রামে আসার পথে জমিতে কারো কারো পাত কুঁয়ো

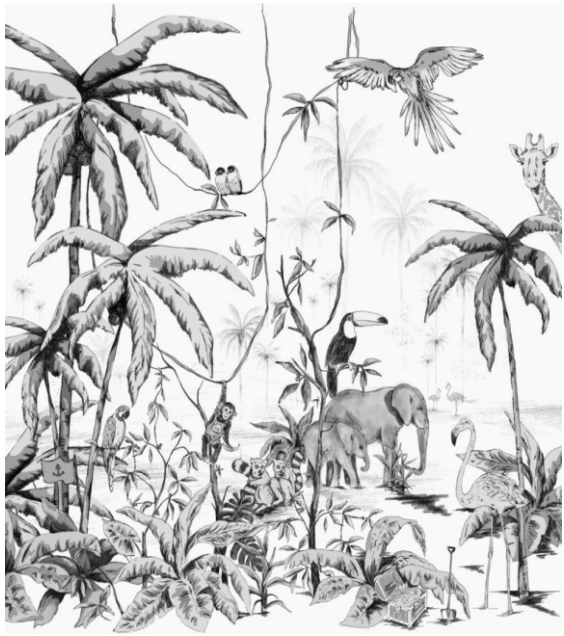

থাকে, মানে আছে। জমির সমতলে। ঐ কুঁয়ো গুলিতে কোনো পাড় নেই। তাই কখনো কখনো হয়তো এঁকে বেঁকে গ্রামে আসে তার ফলে কিছু কিছু চারাগাছ হাতি পায়ের চাপে চেপটা হয়ে যায়। তবে তার জন্য হাতির উপর আমাদের কোনো রাগ বা অভিযোগ নেই। বরং ভালোই লাগে, খুশি হই।

–খুশি হই মানে ? গাছকে চিড়ে চেপটা করলে খুশি হলি ?

– হ্যাঁ হই, কারণ ঐ জমিতে অন্যান্য জমির অপেক্ষা ফসল ভালো হয়।

– বলিস কিরে ?

– বিশ্বাস না হয় চল গ্রামের লোকের মুখে নিজের কানে শুনবি। আমি সত্যি না মিথ্যে বলছি।

– মিথ্যা তুই বলবি না তা আমি জানি। বিশ্বাস আমার আছে। তোর ওখানে মানে জঙ্গল মহলে রাতে থাকার কথা কখনো ভাবি না, তবে যদি কখনো সকালের দিকে যাবার সুযোগ হয় অবশ্যই যাবো। আপাতত তোর জঙ্গল ও হাতিকে গড়। বাস এসে গেছে, এখন চলি। রাতে ফোনে কথা হবে, বাই–।

আদিবাসীদের শালুই বা বনপূজা

গোপাল দাস

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা ব্লকের অন্তর্গত মলিঘাটীর ৭ নম্বর অঞ্চলের আদিবাসীদের শালুই বা বনপূজা। মলিঘাটীর ফুটবল ময়দানে চিরাচরিত প্রথা মেনে বিভিন্ন গ্রামের আদিবাসী পরিবার মিলিত হয়ে এই বিশেষ উৎসব বা মেলার আয়োজন করা হয়েছিল।

আদিবাসী সংস্কৃতির সাথে বাঙালীদের অনেক মিল রয়েছে। বাঙালীদের যেমন বার মাসের তের পার্বন তেমনি আদিবাসীদেরও অনেক উৎসব। শালুই বা বনপূজা অন্যতম। শালুই বা বনপূজাকে অনেকে বাহা বঙ্গা বলে থাকে। সাধারণত প্রকৃতিতে বসন্ত ঋতুর আগমনে আদিবাসী ভাই-বোনেরা আগত মরসুমে প্রকৃতির কাছে নতুন ফল-ফুল, পাতা ব্যবহারের অনুমতি নিতে এই পূজা বা উৎসব করা হয়। শাল বা যে কোন বাগানের তলায় গরান থানে শালপাতা, শালফুল মহুলফুল সহ নানান জিনিস দিয়ে এই পূজা বা উৎসব করা হয়।

মলিঘাটী ও তার আশপাশের গ্রাম থেকে আগত একত্রিশটি পরিবার মিলিত হয়ে এই উৎসবের আয়োজন করে থাকেন। বাঙালীদের ছয়টি ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু হল শ্রেষ্ঠ ঋতু। তাই অনেকে একে ঋতুরাজ বসন্ত বলে থাকেন। বসন্ত ঋতু হলো সৌন্দর্য্যের প্রতীক। শীত ঋতুর অবসান ঘটিয়ে বসন্ত ঋতুর আগমন। শীতঋতু হলো ঘুমন্ত ঋতু। প্রকৃতির মধ্যে একটা অলসতাভাব দেখা যায়। গাছের পাতা ঝরে পড়ে। প্রকৃতির মধ্যে বিবর্ণ বিষন্নতাভাব দেখা যায়। আর এই ঘুমন্ত ঋতুর আগমনে বসন্ত আজ জাগ্রত দ্বারে। প্রকৃতিতে একটা সাজো সাজো রব পড়ে যায়। গাছে গাছে ফুলে-ফলে ও সবুজ পাতায় ভরে যায়। নানান রঙের ফুলের সৌরভে চারিদিক ম ম গন্ধে ভরে যায়। অলিরা ফুলে ফুলে মধু সংগ্রহ করে মধু বানায়। আদিবাসীদের মধ্যে ও এই বসন্ত ঋতুতে বনপূজা করে থাকে।

কোল, হো, মুন্ডা আদিবাসী সম্প্রদায়ের

একত্রিশটি পরিবার ১৬ই মার্চ ২০২৪ শনিবার সকাল ১০টা থেকে এই পূজা আরম্ভ হয়। এই পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো একটি ধ্বজা বাঁশ পুঁতে চারিদিকে রঙিন কাগজ ও বিভিন্ন লতাপাতা, গাছের ডালপালা দিয়ে সাজানো হয়। এই পূজায় আদিবাসী সমাজের একজন পুরোহিত বা মোড়ল থাকে। তারই কথা মতো পূজার সমস্ত আচার-উপাচার পালন করা হয়। একত্রিশটি পরিবার একত্রিশটি উনান তৈরী করে নতুন মাটির হাঁড়িতে করে রান্না করা হয়। দেবতা বা বঙ্গাকে খুশী করার জন্য দেশী মুরগী বলি দিয়ে রান্না করে দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এই রান্না করার উদ্দেশ্য একটা বিভিন্ন আদিবাসী মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বার্তা বিনিময় করা। একত্রিশটি পরিবার এক পংক্তিতে বসে খাওয়া-দাওয়া করতে থাকে এবং একে অপরের সাথে পারিবারিক সুখ-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রনা, মান-অভিমান ভাগ করে নেয়।

খাওয়া দাওয়ার পর যত বেলা গড়াতে থাকে তত মানুষের ভিড় জমতে থাকে, আদিবাসী মহিলারা, পুরুষ ছেলেমেয়ে সকলে পোষাক পরে ধামসা মাদলের তালে

নাচতে নাচতে বিভোর হয়ে পড়ে। মহিলাদের সাথে পুরুষেরাও পায়ে পা মিলিয়ে কোমর দুলিয়ে হাত ধরাধরি করে নাচের মাত্রা আকর্ষনীয় করে তুলে। যত রাত্রি বাড়তে থাকে তত আকাশ বাতাস মাতিয়ে তুলে। সেই সঙ্গে পুরোহিত মশাই মঙ্গলপূর্তি, ধূপ-ধূনা, কাসর-ঘন্টা, বাজিয়ে নানান রকম অঙ্গভঙ্গি করে দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে থাকে। রঞ্জিত গঁদুয়া বলেন এই মন্ত্রপাঠ করার সময় অনেকে অজ্ঞান বা মূর্ছা যায়। নাচ-গান আর পুরুত মহাশয়ের মন্ত্রে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। আদীবাসী মানুষেরা আনন্দ করতে করতে কখন যে রাত গড়িয়ে যায় কেউ ভাবতে ও পারে না। কচি-কাঁচা বুড়ো সকলের উন্মাদনায় মাতাল হয়ে যায় এই উৎসব। বর্তমানে বাঙালীদের মতো আদিবাসী ভায়েরা, আদিবাসী যাত্রা ও অর্কেস্ট্রার আয়োজন করে থাকে। প্রত্যেক পরিবার পাঁচশত টাকা করে চাঁদা তুলে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। আদিবাসীদের সেই জনপ্রিয় গান "মারাং বুরু তু অকারে।" আকাশ বাতাস মাতিয়ে কচি-কাঁচারা কোমর দুলাতে থাকে। এইভাবে রাত শেষ হয়ে পূর্ব আকাশে সূর্যমামা উঁকি দেয়।

সকালে দধি মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। পুরোহিত মঙ্গল পূর্তির তত্ত্বাবধানে সমস্ত কিছুর আয়োজন করা হয়। দধি মহোৎসব অর্থাৎ আমাদের কুঞ্জভাঙার সমান। নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সবাই ধামসা - মাদল বাজিয়ে কোমর দুলিয়ে জল ঢেলে গাছের ডালা-পালা নিয়ে উদ্দাম নৃত্য করতে থাকে। কাদা মেখে সকলে ভূতের মতো হয়ে যায়। কাউকে চিনতে পারা যায় না।

দুপুর পর্যন্ত দধি মহোৎসব চলার পর সকলে যখন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে তখন উৎসব বন্ধ হয়ে যায়। উৎসবের পর কয়েকজন মহিলা ঈষান কোণে আকাশের পাণে ভ্যাল ভ্যাল করে তাকিয়ে কাঁদতে থাকে আর তাদের

মারাং বুরুর কাছে মনে মনে অভিমানের সুরে বলতে থাকে " হে মহান দেবতা আগামী দিনে আমাদের জীবন সুখময় করে তোলো।" জীবন থেকে শোক-দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা, ব্যাথা-বেদনা, গ্লানি-যন্ত্রনা মুছে দাও। সবার জীবন সুখ-শান্তি সমৃদ্ধি বিরাজ করুক। এই অনুষ্ঠানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যতক্ষণ না পর্যন্ত উৎসব শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ মদ স্পর্শ করে না, শুধু হেঁড়িয়া পান করে। উৎসবের শেষে কয়েকজন আদিবাসী ভাই ও বোনেরা মুখ কালো করে বসে আছে। আমি তাদের কাছে জানতে চাইলাম- "তোমাদের মনে কিসের দুঃখ ? তখন তারা মনে দুঃখ চেপে রেখে কাঁদমনি, গুরুবারী কদম সহ অন্যান্যরা বলতে লাগলো - বর্তমানে বন-জঙ্গল, ধ্বংস করে বড় বড় শহর নগর গড়ে উঠছে। তাই আগের মতো আর খোলা মনে উৎসবে নাচতে পারি না। আর আমাদের বড় বঙ্গাকে শান্তি ভাবে ডাকতে পারিনি। আমরা সকলের কাছে আবেদন জানাই যে আর বন জঙ্গল ধ্বংস না করে নতুন করে আরও গাছ লাগাও। সারা পৃথিবী আবার সবুজে ভরে যাক। আমরা আগের মতো সাবলীলভাবে বাঁচতে পারি।

যুদ্ধক্ষেত্র

ছবি প্রামাণিক

তরুনদা বোধহয় আমাকে নিয়ে আজকাল একটু বেশিই ভাবনা চিন্তা করেন। বরাবরই উনি আমাকে খুব সম্মান করতেন, কিন্তু আজকাল বড্ড বেশি ভাবপ্রবণ বলে মনে হয়। তা-নাহলে কতলোকই তো - জীবনের কষ্টের কথাগুলো তার গোপন ডায়েরীতেই লিখে রাখে, বিশেষ করে মেয়েরা। সমাজে আজও যারা অনেক ক্ষেত্রেই শাসনে - শোষনে নানাভাবে নিপীড়িতা, নির্যাতিতা হয়ে অসহায়ভাবে জীবন কাটায়। বিশেষ করে শ্বশুর বাড়ীতে। কজন মেয়েই বা তার শ্বশুর বাড়ীতে বাড়ীর মেয়ের মতো আদর যত্ন পায় ? তাই খুঁটি নাটি ব্যাপারে আজ ও যারা অনাদরে - অবহেলায় দিন কাটায়, তারা তাদের যন্ত্রনার কথা গুলোকে মনের খাতায় লিখে রেখে নিজেকে কিছুটা হাল্কা করে নেয়। লিখতে লিখতে দুচোখের বৃষ্টি ধারায় নিজেকে ভিজিয়ে নিয়ে আবার ও পরের দিনের লড়াইয়ে সামিল হয়। ডায়েরী লেখার এই অভ্যেসটা ও আমার বহু পুরোনো একটা অভ্যেস। আর সেটা বারকয়েক তরুনদার চোখেও পড়ে যায়।

তরুনদা আমার স্বামী নিখিলের পরিচিত। বন্ধুই বলা চলে। ভারী মিষ্টি ব্যবহার। আর তেমনি শান্ত স্বভাব। হঠাৎই একদিন এক পথ দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রীর অকাল মৃত্যু হয়। কোনক্রমে তরুনদা আর তাঁদের একমাত্র সন্তান পুষ্পক সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যায়। পুষ্পকের বয়স তখন মাত্র বছর সাতেক হবে। কম বেশী চোট এনাদের ও লাগে। কিন্তু সেই ঘটনাস্থলেই পুষ্পক তার মাকে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলে। সেদিনের পর থেকে তরুনদা তাঁদের মিষ্টি সম্পর্ককে অক্ষত রাখার জন্য, দ্বিতীয় আর বিয়ে করেন নি। আজ ও বাবা ছেলেতে মিলেই সংসারটাকে সামলে চলেছেন।

তরুনদা একজন স্কুলশিক্ষক। আর স্কুলটা আমাদের বাড়ী থেকে মাত্র কয়েক পা দূরে। রাস্তার ঠিক উল্টো দিকে। আমাদের বাড়ীটা একেবারে বড় রাস্তার উপরেই। পাশাপাশি বাজার-দোকান সবকিছুই। আমাদের ব্যবসাপত্র ও ওখানেই। জামাকাপড়ের মস্ত বড় একখানা দোকান। হালে হালে শাড়ীর ও বেশ বড় একখানা শোরুম খোলা হয়েছে। বাড়ীর দুই ছেলে এবং আমার শ্বশুর মশাই মিলে এসবের দেখাশোনা করেন। তাছাড়া লোকজন তো রয়েইছে। সেই কোন ছোটবেলায় আমি এ-বাড়ীতে বৌ হয়ে এসেছি। আমার বাবার ও গ্রামের মধ্যেই ছোট্ট একটা জামা কাপড়ের দোকান ছিল। বাবা সে সময় শহর থেকে অর্থাৎ আমার শ্বশুর মশাইয়ের কাছ থেকে অল্প-বিস্তর মালপত্র কেনাকাটা করে গ্রামের মধ্যে ঐ দোকান খানাকে সাজাতেন। আর সেই থেকেই ওনাদের চেনা জানা। আমার বাবা সামান্য কটা টাকার ব্যবসায়ী হলে ও, আমার শ্বশুর মশাইয়ের কাছ থেকে তিনি কখন ও কোন অমর্যাদা পান নি। বরং হঠাৎই সে সময় আমার শ্বাশুড়ী মা ভীষণ অসুস্থ থাকায়, বাড়ীর পরিস্থিতি একরকম খারাপ পর্যায়ে চলে যায়। এতবড় ব্যবসা সামলে এনাদের পক্ষে তখন মায়ের সম্পূর্ণ দেখভাল করা সম্ভব ছিল না। তাই বাড়ীর চাকর বাকরদের কাঁধেই বাড়ীর সব রকমের দায় দায়িত্ব গিয়ে পড়ে। আর ঐ সময় আমার বাবার কাছে একরকম অনুরোধ করেই আমার শ্বশুর মশাই আমাকে এ বাড়ীর বউ করে আনেন। তেলে আর জলে খায় না বলেই - আমার বাবা প্রথমে এই বিয়েতে রাজী হন নি। তবে আমার শ্বশুর মশাইয়ের বিশেষ অনুরোধ ও তিনি ফেলতে পারেন নি। তাই কোনরকমে আমাদের বিয়েটা হয়ে যায়। আমি তখন সবে ক্লাস ইলেভেন থেকে টুয়েলভে উঠেছি। পড়াশোনার প্রতি ভীষণ জেদ থাকা সত্ত্বে ও, সেদিন শুধুমাত্র আমার বাবার মুখ চেয়ে জীবনের সমস্ত ভালোলাগাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হয়। শেষমেশ বসে পড়ি বিয়ের পিঁড়িতে। বয়সটা বড্ড কম। আমার স্বামী আমার থেকে বয়সে অনেকটাই বড়। কিন্তু ভাগ্যের লিখন আর খন্ডায় কে ? বড়লোকের ছেলে, বিয়ের পর থেকে সবসময় সবটা ওনার

মর্জি মতোই চলতে থাকে, উনি যে আমাকে একেবারেই নিজের অমতে, শুধুমাত্র বাড়ীর পরিস্থিতি এবং বাবার কথা রাখার জন্য এই বিয়েটা করেছেন।- এ বাড়িতে আসার পরে পরেই তিনি তা বেশ স্পষ্টভাবেই বুঝিয়ে দেন। পরে বুঝতে কোন অসুবিধাই হয়নি - যে আমি এ বাড়ীর দাসী মাত্র।

এ বাড়ীতে আসার পর আমার পরিচর্যায় শ্বাশুড়ী মা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন ঠিকই, কিন্তু পরে আমার বাপের বাড়ী সম্পর্কে সবটা জানার পর উনি ও আমাকে ভীষণ অপছন্দ করতে শুরু করেন। কারণ তিনি নিজে একজন এতবড় বাড়ীর বউ। তাছাড়া ওনার বাপের বাড়ী ও এককালের জমিদার বংশ। শিক্ষায়-দীক্ষায়-আভিজাত্যে সবদিক থেকেই ভীষণ উন্নত পরিবার। তাই আমাকে মেনে নেওয়াটা ওনার কাছে ও কষ্টকর হয়ে ওঠে। তবে তিনি তাঁর ছোট ছেলের বিয়ে নিয়ে খুব খুশী। একদম ওনার পছন্দসই। চাল-চলন-আদব কায়দা এমন কি শিক্ষা-দীক্ষায় ও সে এ বাড়ীর উপযুক্ত একজন। বাপের বাড়ীর অবস্থা ও বেশ সচ্ছল। তাই সবদিক থেকেই এ বাড়ীতে আজ ও আমি খুব একা, খুব অসহায় একজন মানুষ। শ্বশুর মশাই এবং আমার একমাত্র সন্তান কৌস্তভ ওরফে কর্ণ ছাড়া আজ ও এ বাড়ীর কেউই আমাকে তেমন আপন ভাবতে পারেননি। আত্মীয় স্বজনেরা ও তাই। বাড়ীর আর দুটো কাজের লোকের মতোই সারাটা দিন শুধু কাজ নিয়ে পড়ে থাকা, এবং বাড়ীর সবাইকে খুশী রাখাই আমার একমাত্র কাজ। আর ঠিক সেই যন্ত্রনা থেকেই শুরু হয় আমার ছোট ছোট লেখালেখি।

আমাদের দোকানের গায়েই আছে ছোট্ট একটা চা - টিফিনের দোকান। স্কুল থেকে বাড়ী ফেরার পথে তরুনদা এবং পুষ্পক রোজ ওখান থেকেই নিজেদের চা-জল খাওয়ার সেরে বাড়ী ফিরতেন। ঐ একই আড্ডায় আমার স্বামী ও মাঝে মাঝে সামিল হতেন। সেই থেকে ওনাদের মধ্যে আলাপ পরিচয়। পরে ওনাদের মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাছাড়া ঐ একই স্কুলে আমাদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও পড়াশোনা করে। স্কুলে তরুনদা অংকের ক্লাস নিতেন। পরে অবশ্য তিনি এবাড়ীর ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউটর হিসেবে ও যোগদান করেন। সেই থেকেই ওনার সঙ্গে এবাড়ীর প্রত্যেকেরই একটা সু-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখন প্রায় রোজই তরুনদার এ বাড়ীতে অবাধ যাতায়াত। সেই সঙ্গে পুষ্পকের ও।

পুষ্পক কর্ণের চেয়ে মাত্র মাস কয়েকের ছোট। দুজনেই এখন ক্লাস টুয়েলভের ছাত্র। ইদানিং ওরা দুজন ও দুজনের বেশ ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছে। মা-মরা ছেলেটার প্রতি আমার ও ভীষণ মায়া পড়ে গেছে। ও এখন আমার ও ভীষণ কাছের একজন। আর ওরা বাবা ছেলেতে ও ইদানিং আমার সঙ্গ পেলে বেশ খুশী হন। বোধহয় ভারসা ও পান। ওদের ঐ ভালোবাসাটুকুই যে এখন আমার সম্বল হয়ে উঠেছে। যার মান এ বাড়ীর কারো কাছে তেমন গুরুত্ব না পেলেও, তরুনদার হয়তো মনে ধরেছিল, উনি আমাকে যেমন সম্মান করতেন, তেমনি আমার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো কখনো ওনার চোখ এড়াতো না। তাইতো আমার সারাদিনের কাজের শেষে অবসরে ডায়েরী লেখার অভ্যেসটা ও ওনার অজানা ছিল না। সেই দেখে মাঝে মধ্যেই উনি মজা করে আমায় প্রশ্ন করতেন - কি লিখছেন বৌদি ? প্রেমের গল্প টল্প নাকি ? তা-বেশ-ভালো। এই শখটা কিন্তু একরকম আমারও। মাঝে মধ্যে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আমার লেখা ছোট গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। আপনার কাছে ও তেমন কিছু থাকলে - আমায় দিতে পারেন। তরুনদার কথাগুলো যে এবা ড়ীর প্রত্যেকের কাছে ভীষণ হাস্যকর মনে হতো, তা বুঝতে আমার বিশেষ অসুবিধে হতো না। তবে আমি নিজে ও এসব একেবারে অবান্তর বলে ভাবতাম। না না - আমার এই সামান্য জ্ঞান - বুদ্ধিতে কি আর এসব সম্ভব নাকি ? আর প্রেম ? সেতো কবেই হারিয়ে এসেছি। বুবুনদার সেই জলভরা চোখদুটোর কথা, ভাবলে আজও মনে ভীষণ দাগ কাটে। একদিন সবার অলক্ষ্যে বেড়ে ওঠা সম্পর্কটা হঠাৎই এক দমকা হাওয়ায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। মাঝখানে শুধু বুকভরা হাহাকার, আর তীব্র যন্ত্রনার গভীর আর্তনাদ

একসময় নিঃশব্দে মাথা কুটে মরেছে। সে খবরে যদিও আজ আর কোন কাজ নেই। কিন্তু এসব নিয়ে কি আর গল্প হয়। তবে সত্যি সত্যিই যদি হতো ?

তারপর একসময় আকাশ-পাতাল এসব নানানভাবনা থেকেই মনে হতে লাগলো, আমার গোটা জীবনটাই তো মস্ত একটা উপন্যাস। এর থেকে বড় উদাহরণ আর কীই বা হতে পারে। তবে কি শুরু করা যায় ? এইভাবে তোলপাড় করা মনটাকে শান্ত করতেই বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। মনে হতে লাগলো মাঝ সমুদ্রে পড়ে রাতদিন কেবল হাবুডুবুই খাচ্ছি। কূল কিনারা কেমন যেন সব হারিয়ে ফেলেছি। বুঝে উঠতে পারছিলাম না ঠিক কীভাবে শুরু করা যায়। তারপর এক এক করে মনে পড়ে গেল - হঠাৎই পালটে যাওয়া জীবনের কথা। মনে পড়ে গেল আমাদের মতো অসহায় নারীদের জীবনের প্রত্যেকদিনের লড়াইয়ের খুঁটি-নাটি হিসেব গুলোর কথা। কীভাবে আড়ম্বরহীন আদুরে জীবনের গন্ডি পেরিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা - অজানা এক যুদ্ধক্ষেত্রে পা- দেওয়া। প্রতিটা দিন, প্রতিটা মুহূর্তে কী- ভীষণ অসহায়তা, আর একাকীত্বতায় ভরা জীবন। যেখানে দাঁড়িয়ে চেনা মুখ গুলো - মনে পড়লে ও মনে পড়া বারণ। দেখতে ইচ্ছে করলে ও দেখা করা বারণ। মন খুলে দুটো কথা বলা বারণ। হাজারো দুঃখ-কষ্টে বুকটা ফালা-ফালা হয়ে গেলেও চোখের জল ফেলা বারণ। ছোট্ট কোন ভুলের কী- যন্ত্রণাদায়ক মানসিক শাস্তি ভোগ। জীবনটা যেন সবার অযত্নে সংসারের এককোণে পড়ে থাকা এক আস্তাকুঁড়ে। যেখানে প্রত্যেকের সমস্ত রাগ - অভিমান, অবজ্ঞা-অসম্মান, হাজারো - অকথা, কুকথা যাবতীয় যা কিছু খুব সহজে ঝেড়ে ফেলা যায়। কেউ কোনদিন খবর ও রাখেনা যে বুকে এত যন্ত্রনা এত সহজে ঝেড়ে ফেলা হলো, তার বুকে ঠিক কতখানি জায়গা আছে, যে - সে এ সব কিছু ধরে রাখতে পারবে তো ? দুঃখে কষ্টে যন্ত্রনায় তার বুকটা ছট্‌ফটিয়ে উঠবে না ?

ঠিক এইভাবেই জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে সংসারের যাঁতাকলে পিষে মরার কাহিনী গুলো কখন কীভাবে যে নাটক, গল্প, উপন্যাস হয়ে উঠলো। তা বোধহয় আমি নিজে ও বুঝে উঠতে পারিনি। আরও অবাক হলাম তরুনদার কাছ থেকে যেদিন জানতে পারলাম, আমার-ই লেখা নানান উপন্যাস নিয়ে তৈরী হচ্ছে বিভিন্ন চিত্রনাট্য। তারমধ্যে একটির জন্য আমি বিশেষভাবে পুরস্কৃত ও হয়েছি। সেদিন মুহূর্তের জন্য আমার কাছে আমার চেনা পৃথিবীটাও হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল। ভুলে গেলাম প্রত্যেকদিনের চেনা সংসার জীবনের কথা। হঠাৎই এক অদ্ভুত আলোর স্পর্শে আমার চারপাশের ফিকে রঙটা কেমন যেন আলোয় ঝলমলিয়ে উঠলো। সবকিছুই একেবারে অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে লাগলো। কিন্তু সবকিছু সত্যি সত্যিই হলো। জানি, এরপর আমাকে আবার ও ফিরে যেতে হবে আমার প্রত্যেকদিনের চেনা সেই যুদ্ধক্ষেত্রে। যেখানে অনেক অবহেলা, অনেক দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে তবু ও ছোট্ট এই একটা মুহূর্ত থেকে আমি আমার জীবন যুদ্ধের ঠিকঠাক কৌশল শিখে নিলাম। শিখলাম জীবনে আরও বড় যোদ্ধা হতে। বিনা প্রতিবাদে ও যে যুদ্ধ খুব সহজে জয় করা যায়।

ছোটবেলায় বাবা সাধ করে আমার নাম রেখেছিলেন তুলসী। কিন্তু আমার নামটা পর্যন্ত এ বাড়ীর কারো কাছে ঠিক পছন্দের নয় বলে, সেই নামটা ও একদিন জীবন থেকে মুছে গেছে। কিন্তু কাঁটার উপর হাঁটতে হাঁটতে সেই তুলসীর কখন যেন ঈশ্বরের চরণে ঠাঁই হয়েছে। আজ যেন সেই ঈশ্বরের রূপ নিয়ে স্বয়ং তরুণদাই আমার সামনে দাঁড়িয়ে। দূরে থেকেও আজ যিনি আমার ভীষণ কাছের একজন। আমি দীন, আমি জ্ঞানহীন জেনে ও তিনি আমায় দূরে ঠেলে দেন নি। আমার জীবনের ছোট ছোট ভালো-মন্দের হিসেব আছে যাঁর কাছে। মনে মনে তিনিই তো আমার আসল ঈশ্বর। জীবনে এইটুকু প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য, আমার আমিকে চিনিয়ে দেওয়ার জন্য দূর থেকে আজ তাঁকে আমার শত সহস্রবার প্রণাম জানানো ছাড়া যে, অন্য কোন গতি নেই। মাঝখানে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু নতুন করে বুবুনদার কথা আজ খুব মনে

পড়ছে। কারণ, সেদিন বুবুনদার চোখে আমাকে নিয়ে দেখা স্বপ্নগুলো আজ আবার সেই একইভাবে তরুনদার চোখেও যেন জ্বল-জ্বল করছে। শুধু প্রকাশের ভাষাগুলো আজ হারিয়ে গেছে। ভাষাগুলো হয়তো স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে অনেকখানি পথ এগিয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তব সেখানে মস্ত বড় পাঁচিল হয়ে দুজনের পথ আগলে বসে আছে।

With Best Compliments From :-

Dr. Suddhasatwya Chatterjee

Consultant Internal Medicine
Rheumatologist and Diabetologist

Senior Consultant, Apollo Gleneagles Hospitals Limited

MBBS (Cal), DNB (MED)
Mobile : 8334839997
Regn. No. : WBMC - 60561

Specialist In :

Joint & autoimmune Diseases
Diabetes & Its Complications
Chronic multiple Old Age Problems
Oncological Problems
E-mail : suddhasatwyachatterjee@gmail.com /
Website : www.diabetologistinkolkata.com / www.healtytouch.co.in

Chambers :

The Apollo Clinic : For Purba & Paschim Medinipur
Santi Medical, Pahari Complex, School Bazar, Kathi
Contact No: 7059901065/9007327033
Max Health, Balichak , Lockgate, Ph. : 7059901065/9007327033
Mahamaya Medical, Mohonpur Bus Stand, Near CPM Party Office,
Ph No. : 7059901065/9007327033
Deep Kamal Medical, Hospital More, Tamluk, Ph No. : 7059901065/9007327033
Calcutta Clinical Laboratory Paniparul, Ph. No. : 9007327033/7059901065/9732862368
For appointment : 9007327033, Mr. Joy Banerjee (Secretary)
Mr. Anshuman Roy (Secretary) 6289931557 / 7059901065

ঘুম

পশুপতি ভঞ্জা

প্রথমেই বলি, এটি কোন গল্প নয়। জীবন পথে ঘটে যাওয়া অজস্র ঘটনার মধ্যে বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা যা নিজেকে সমাজ এবং জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুনরূপে চিন্তাভাবনা করতে শিখিয়েছে সবকিছু।

এক অদ্ভুত রোগের শিকার হয়েছি আমি। কিছু করতে ভাল লাগেনা। কোথাও যেতে ভাল লাগেনা। বন্ধুবান্ধদের সঙ্গে আড্ডা দিতেও ভাল লাগেনা। পরিচিত চা দোকানটায় বহুপরিচিত কিংবা অপরিচিত লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেও আজকাল আনন্দ পাইনা। বাজার কিংবা হাটে গেলে ঘুরে ফিরে সবকিছু জিনিস না দেখে জিনিসের গুণমান যাচাই না করে দরদাম না করে কিছু কিনে নিয়ে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসি।

বাড়ি ফিরেও আনন্দ পাই না। বাড়িতে শুয়ে বসে কিংবা টিভি দেখেও আনন্দ পাইনা। বাড়িতে থাকতে হয়- আছি। খেতে দেয় খাচ্ছি। কতো কাজ করার রয়েছে–অথচ আমি কিছুই করছিনা। এমন হলে সংসার অচল হয়ে যাবে। আমার সংসারে হাল ধরার মতো কেউ নেই। কাজের মধ্যে একমাত্র স্ত্রী। সে আর একা কতদিক সামলাবে। ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করছে। আমার সংসারের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাই আমি খুব চিন্তান্বিত।

অথচ একবছর আগে-আমার সংসারের এমন অবস্থা ছিলনা। কাজ কমবেশী নিজেই করতাম। যদিও গৃহস্থালী কাজকর্মে আমার খুব একটা প্রয়োজন পড়তনা। চাকরির সুবাদে বাইরে থাকতাম। দু'একদিনের ছুটিতে বাড়ি এলে বড় কাজগুলো নিজে উদ্যোগ নিয়ে করে দিতাম। বাকি কাজ আমার স্ত্রী সামলে নিত।

একান্নবর্তী পরিবারে জন্মের ফলে জ্ঞান হওয়ার পর থেকে লেখাপড়া ব্যতীত গৃহস্থলীর কাজকর্ম আমাকে খুব একটা করতে হয়নি।বাবা ছিলেন। তিনি সব কাজ সামলে নিতেন। কিন্তু চাকরি থেকে রিটার্য়া করার পর দেখলাম বহু কাজ বাকি। যে কাজগুলো আমার একার দ্বারা

করা কিছুতেই সম্ভব নয়। যাদের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন-করলাম। মুখে সবাই হুঁ হ্যাঁ করল। কিন্তু বেশ কয়েকবার ঘুরে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও কাজের কাজ যখন কিছুই হলনা তখন মন খারাপ হলো। নিজের অতিপরিচিত লোকজনদের অপরিচিত মনে হতে লাগলো। যতদিন ক্ষমতায় ছিলাম বিনা পয়সায় অপরের কাজ করে দিয়েছি। এখন যেন তারা আমায় আর চেনেনা। দুঃখ হয়। কিন্তু করার মতো আমার হাতে বিশেষ কিছু নাই।

পাঁচ মাস আগে গরমের দিনে আমাশয় দীর্ঘদিন ভুগেছিলাম। এলোপ্যাথি চিকিৎসায় দীর্ঘদিন ঔষধ খেয়েও ঠিকঠিক উপকার হয়নি। ঔষধ বন্ধ করে সাধারণ চিকিৎসায় আমাশা ভালো হয়ে যায়। শরীরটা তারপর থেকে ভীষণ দুর্বল লাগে। তার কিছুদিন পর থেকে ঘুমের ব্যাঘাত হতে থাকে। অদ্ভুত রোগের শুরু।

ঘুম কিছুতেই আসে না। দিনরাত সমান। কিছু খেতে ইচ্ছা করে না। শরীর দ্রুত ভেঙ্গে যাচ্ছে। ছুটলাম ডাক্তারবাবুদের কাছে। ছুটলাম হাসপাতালে। কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। দেখালাম একজন মানসিক বিশেষজ্ঞকে। এক মাসের ঔষধ। এক ডোজ খেয়ে দু'দিন অচৈতন্য। নড়াচড়া করার ক্ষমতা নাই। জ্ঞান ফিরতে মেয়ে বলল-বাবা তোমার কিছু মনে আছে? সীতা পিসিমা বাড়িতে এসেছিলেন। তুমি দুদিন অচৈতন্য ছিলে-।

আমি বললাম না। অনেক ভেবে পরে বললাম- মা, আমার

এমন চিকিৎসার আর প্রয়োজন নাই। যদি মরে যাই-দুঃখ করোনা। দেশের লোকজন ডেকে জ্বালিয়ে দিও। কিন্তু ওই ডাক্তারবাবুর ঔষধ খেতে আমায় আর তোমরা অনুরোধ করবে না।

উনার ঔষধ সত্যিসত্যি আমি আর খাইনি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওজন কমে যায়। প্রেসার কমে গেছে। চলাফেরা করতে পারি না। সামান্য কিছু খেয়ে বিছানায় পড়ে থাকি। ঘুমোনোর চেষ্টা করি। ঘুম কিন্তু আসেনা। আজে বাজে কথা মনে হয়। কিছু ভালো লাগে না। মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকি। মনে একটা ধারণা বদ্ধপরিকর হতে থাকে যে কোন সময় আমি মরে যাব।

কোথায় যাব-কাকে দেখাব আত্মীয় স্বজনরা নানা ডাক্তারবাবুদের কথা বলে। কাউকে ভরসা পাইনা। বহু খোঁজ খবর নিয়ে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবুর কাছে যাই। তিনি আমার কথা মনযোগ সহকারে শোনেন। আমার পরীক্ষা করেন ভালভাবে। একুশ দিনের ঔষধ প্রেসক্রাইব করেন। ব্লাডটেস্ট করাতে বলেন। আমি নিয়মিতভাবে ঔষধ খেয়ে যাই। কোন উপকার বুঝতে পারিনা। ঘুম দুচোখে কিছুতেই আসেনা।

পরিচিতির মাহাত্মে উনার কাছে দ্বিতীয়বার যাই। উনি আমার সবকথা শোনেন। আমায় পরীক্ষা করেন ভালভাবে। বলেন আর কয়েকটা দিন একটু ধৈর্য ধরুন। আপনার ব্লাড সুগার নেই। ঔষধ পাল্টে দিচ্ছি। আশাকরি উপকার পাবেন। গতবার ঘুমের ঔষধ দিয়েও কোন উপকার হয়নি। তাই এবার তার ঘুমের ঔষধ দিলামনা। আশা করছি উপকার হবে। বাকিটা ঈশ্বরের হাতে।

নিরাশাকে সঙ্গী করে পুনরায় ঔষধ খেতে শুরু করলাম। নিরাশা আশায় পরিণত হতে লাগল ধীরে ধীরে। পনের দিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম আমার উপকার হচ্ছে। দুচোখ জুড়ে ঘুম আসছে। খিদে বাড়ছে। ধীরে ধীরে বাড়ির মধ্যে হাঁটতে শুরু করলাম। আগে আদৌ হাঁটতে পারতাম না। ধীরে ধীরে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে একটু একটু করে পথ বাড়াতে লাগলাম।

প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হতো। মাথা ঘুরতো। হাত পা থরথর করে কাঁপতো। ঘাম ঝরতো। মেয়ের সাহায্য নিতাম। ডাক্তারবাবুকে সব কথা ফোনে বলতাম। জানাতাম। তিনি অভয় দিয়ে জানান - সব কিছু করব ধীরে ধীরে। শরীর ভেঙ্গে গেছে। সুস্থ হতে সময় লাগবে। আপনি ভাল হয়ে যাবেন।

বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। সুস্থবোধ করলাম দুমাসের মধ্যে। আট দশমাস যার চোখে ঘুম ছিল না। দিনরাত সমান তার চোখে স্বাভাবিক ঘুম আনানো খুব সহজ সরল ব্যাপার নয়। কথায় বলে, শরীরের রাজা ঘুম। ঘুম ঠিকঠাক হলে তবেই তো সবাই গাইবে -নাচবে-বাজাবে-ধূম মাচালে ধূম। ডাক্তারবাবুকে অজস্র ধন্যবাদ আমাকে সুস্থ করার জন্য। তারই দয়ায় ফিরে পেলাম জীবন। হারালাম স্মৃতিশক্তি। যা বহুভাবে দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও পূর্বাবস্থায় কিছুতেই পৌঁছালনা। হারালাম দাঁত। হারালাম দৃষ্টিশক্তি। নতুন করে চিনলাম মানুষরূপী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের। যাদের আপদে বিপদে সারা জীবন সাহায্য করেছি আমার চরম বিপদের দিনে কেউ তারা আমার পাশে নেই।

আশীর্বাদের ফসল

শংকর মাইতি

মানুষের শরীরের প্রধান অঙ্গগুলির মধ্যে চোখই হল সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ। মানুষের শরীরের অঙ্গ বলতে দুটো হাত, দুটো পা ও দুটো চোখ বোঝায়। চোখ থেকেও না থাকা মানে জীবমৃত অবস্থায় থাকা। কেউ জন্মান্ধ হয় আবার অনেকে বয়সের কারণে বা বিভিন্ন কারণে চোখে ছানি পড়ে অন্ধত্ব লাভ করে। পৃথিবীতে বেশ কিছু মানুষ আছেন উদর পূর্ত্তি করে জীবন যাপন করেন। আবার বেশ কিছু মানুষ আছেন, চোখকে খাইয়ে জীবনটা উপভোগ করতে। তাই চোখের অপর নাম জীবন বা বাঁচা। চোখ থাকলে সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে পাহাড়, পর্বত, নদী নালা, গাছ ফলফুল- মানুষ দেখে জীবনটা উপভোগ করা যায়। ভগবানের সৃষ্টিকে দেখে আত্মীয় স্বজনকে স্বচোখে দেখে মানুষ জীবনের পূর্ণতা পায়। তাই চোখ থেকেও যারা দৃষ্টিহীন হয়- সেইসব রোগীদের চিকিৎসায় জন্য আজ সারা বিশ্বে - হাজার হাজার হাসপাতাল বা সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি - ব্যবসায়িক বা সমাজ সেবা করার জন্য চক্ষু হাসপাতাল গড়ে তুলেছেন সারা পৃথিবী জুড়ে। আমি আজ এমন এক ব্যক্তি ও সেবা প্রতিষ্ঠানের কথা বলবো যিনি এক বৃদ্ধা মহিলার আশীর্বাদে এক বিরাট চোখের হাসপাতাল গড়ে তুলেছেন এই মেদিনীপুরে। বেশ কয়েক বৎসর আগের কথা। মেদিনীপুর শহর থেকে ৫ কিলোমিটার দূরে কুমারপুর গ্রামের এক যুবক নাম মদন মোহন মাইতি চ্যাটার আকাউটেন্সি ইন্টার পাস করে ঠিক করলেন তিনি জীবনে এমন কিছু করবেন যাতে গ্রামের হাজার হাজার বেকার যুবক নতুন এক কৃষি কাজ করে জীবন যাপন করতে পারে আর গ্রামের হাজারো অন্ধত্ব প্রাপ্তি মানুষেরা অন্ধত্ব দূর করে চোখের আলোয় ফিরতে পারেন। তিনি কয়েক শত মুরগি নিয়ে চাষ শুরু করলেন আর বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্যে কিভাবে মুরগি রোগ থেকে দূরে থাকে, ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় আর সারা ভারতে - এই মুরগি চাষ কিভাবে বাড়ানো যায় তার জন্য চেষ্টা চালান, যেহেতু তিনি উচ্চ শিক্ষিত এবং মুরগির চাষ বৃদ্ধির জন্য শপথ নিয়েছেন তাই খুব কম সময়ের মধ্যে সারাভারতে মুরগি চাষ উন্নতিতে তাঁর নাম অর্থাৎ মদন মোহন মাইতির নাম দেশব্যপি ছড়িয়ে পড়লো। মদনবাবু তার ব্যবসা ছাড়াও রোটারীক্লাবের সদস্য হিসাবে সারা জেলায় ঘুরে ঘুরে চক্ষুরোগে আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে যেতেন চৈতন্যপুর বিবেকানন্দ চক্ষু হাসপাতালে। হাজার হাজার গ্রামবাসী তার ও তার ক্লাবের সদস্যদের চেষ্টায় চোখের আলো ফিরে পেয়েছেন। এমনই এক বৃদ্ধা গ্রামবাসী যার অন্ধত্ব মুক্তি পেয়েছিল মদনবাবুর একান্ত চেষ্টায়। সেই মহিলার কথা আজ বলবো। পাঁচখুরী গ্রামের এক হত দরিদ্র পরিবারে প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়া এক বৃদ্ধার বাড়ীতে মদনবাবু গেলেন চক্ষুপরীক্ষকদের নিয়ে। ওরা চোখ পরীক্ষা করে জানালেন যে দুটো চোখে সম্পূর্ণ ছানি পড়ে অন্ধ হয়ে গেছেন ওই বৃদ্ধা তবে ছানি কাটালে দৃষ্টিশক্তি অনেকটা ফিরে পাবেন। পরেরদিন মদন বাবু তার গাড়ীতে করে প্রায় ১০০ মাইল দূরে চৈতন্যপুর বিবেকানন্দ মিশন হাসপাতালে নিয়ে গেলেন ওই অন্ধত্বপ্রাপ্ত বৃদ্ধাকে। চোখের ছানি অপারেশনের পর চোখের বাঁধন যখন খোলা হল ওই বৃদ্ধা আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে মদনবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বুকভরে আশীর্বাদ করলেন - এই বলে যে বেটা তুই আমায় লজ্জা নিবারণ করলি। মদনবাবু বললেন তুমি তো চোখে দেখতে পারছো- আমি কিভাবে তোমার লজ্জা নিবারণ করলাম। বৃদ্ধা বললেন - আমি চোখে কিছুই দেখতে পেতাম না - কি খাচ্ছি, কি পরছি - কে আসছে বা যাচ্ছে। এই গ্রামের দুষ্টু ছেলেছোকরারা প্রায় আমার কাপড় খুলে নিয়ে পালাত আর দূর থেকে পাগলী পাগলী বলে চেঁচাতো। এখনতো আমি ওদের পিছনে লাঠি নিয়ে ছুটতে পারবো। আর নিজের কাপড়টা নিজে পরে লজ্জা নিবারণ করতে পারবো। আজ তোকে আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুই মানুষের জন্য একটা চোখের হাসপাতাল কর। সেই দরিদ্র গ্রাম্য বৃদ্ধার আশীর্ব্বাদ ধন্য মদনবাবু তার রোটারী ক্লাবের বন্ধুদের নিয়ে মেদিনীপুর শহরে এক বিরাট চোখের হাসপাতাল গড়ে তুলেছেন যা আজ বঙ্গের গর্ব। প্রতি বৎসর ১৫০০০ হাজারের বেশী মানুষের চোখের ছানি কাটা হয় এই হাসপাতালে। দেখুন আশীর্বাদের ফসল কিভাবে ফলে যায়। এইরূপ মদনবাবু হাজার হাজার দরকার এই ভারতবর্ষে। শুধু অর্থ নিয়ে নিজের নয়, মদনবাবুর কথায় কিছু অর্থ জনগণের সেবায় লাগানো প্রতিটি মানুষের কর্তব্য, তবেই হবে জীব সেবা শিব সেবা। বর্তমানে এই

চক্ষু হাসপাতালটি মেদিনীপুর শহরের বার্জটাউনে অবস্থিত। ১০ জন ডাক্তার সহ প্রায় ৮০ জন মানুষ প্রতিদিন কয়েকশত মানুষের চোখের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি বৎসর ১৫০০০ হাজারের বেশী মানুষের চোখের ছানি কাটা হয় যার মধ্যে অধিকাংশই বিনাব্যয়ে। আজ মদনবাবু ও তার রোটারী ক্লাবের বন্ধুদের মহান চেষ্টায় সমগ্র মেদিনীপুর জেলার মানুষ তাদের চোখের আলো ফিরে পাচ্ছেন।

ভারততীর্থ

রঞ্জিত মল্লিক

"..... তোর মরা গাঙে
বাণ এসেছে ...
জয় মা বলে ভাসা তরী...."

শেষ বৈশাখের গনগনে ঝাঁঝাল রোদ্দুরটা প্রশস্ত আমবাগানের ফাঁক ফোকর দিয়ে গলে জোড়া মসজিদের চাতাল ছুঁয়ে মিলিয়ে যেতেই ঝপ করে সন্ধ্যে নামল। মসজিদের আশপাশের থেকে রবি ঠাকুরের স্বগোষিত অহংকার বুদ্ধ পূর্ণিমার রূপোলী চাকতির মতন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে নামছে।

চাতালের তপ্ত মেঝেতে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা গানের তালে তালে পা মেলাচ্ছা। চাতালের এককোণে বসিরচাচা সবার জন্যে সরবত, জুস, দুই-মিষ্টির আয়োজনে ব্যস্ত। তাঁতের শাড়ির আঁচলটা শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে দিদিমণিও ওদের সাথে অঙ্গ দোলাচ্ছেন ...

"নাও, সবাই আবার শুরু কর ....
..এক দুই তিন চার ...."

"এসে হে বৈশাখ...
এসো এসো ...
মুছে যাক গ্লানি ... ঘুচে.. জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা....."

গ্লানি, জরা ঘুচতে দিদিমণির ঘাম, রক্ত, নোনোপানি ঝরাতেই বেশ কিছু বছর পার হয়ে গেল। মসজিদের চাতাল সেদিনের লুঙ্গিপরা নামাজী টুপির গোঁড়া মাথাদের আলোচনায় আরও বেশি উত্তপ্ত।

"শোন বাসির, তোমার ঐ দিদিমণি বড্ড বেশি বেয়াদবি করছে...."

"মাইনোরিটি অধ্যুষিত গ্রামে এইসব কোনদিনও হয়নি।"

"আর আমরা হতেও দেবনা..."

সপ্তাহ ঘুরতেই সলিমুদ্দিনের মেয়েটার হঠাৎ রক্তের ঘাটতি শুরু হল। থ্যালিসেমিয়া বীটা মেজরে আক্রান্ত। বি নেগেটিভ ব্লাডের প্রয়োজন। সলুর বাড়ির লোকজন, পাড়া প্রতিবেশীরা হন্যে হয়ে ঘুরছে দুফোঁটা রক্তের আশায়।

একেই সামার সীজন চলছে। তার উপর রক্তের খরা। গোঁড়া মুসলিম বেল্টে রক্তদানের মহিমা তখনও কেউ বোঝেনি। বাসিরচাচার কপালের ভাংজটা চিন্তায় ছোটনাগপুর মালভুমিকেও যেন টেক্কা দিচ্ছে।

সেদিনটাও ছিল বৈশাখের পঁচিশ। সাদাদাড়ির বুড়ো কবির গলাতে মালা পড়তেই চাতাল ভরে উঠল রক্তদাতাদের ভিড়ে। দিদিমণি নিজেও ব্লাড দিলেন। সেবার "কবি প্রণাম" আর "বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস" একই দিনে পড়েছিল। দিদিমণির বুকের ঘুমন্ত "ভিসুভিয়াস" থেকে গলিত লাভা লাল স্রোত হয়ে নামছে।

সলিমুদ্দিন, রহমত, আনসার, আইসুদ্দিনরা এতদিনে জেনে গেছে দেশটার নাম "ভারতবর্ষ", আর মসজিদের ঐ চালাতটাই যেন কবির "ভারত তীর্থ" ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাই বৈশাখ আসলেই আমবাগানের আড়ালে ত্রিপলের নীচে কচিকাঁচাদের "ভিসুবায়াস" ঝলসে ওঠে....

"...এসো আর্য... অনার্য
মহা....."

মেঘনা দিদিমণিকে সবাই ভুল বুঝেছিল যে, উনি মুসলিম সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করছেন। এখন ঘুম ভেঙেছে সবার।

আজ পঁচিশে বৈশাখ। ঘুম ভাঙতেই জামালুদ্দিন

ছুটেছে ইঁটভাঁটাতে। ধূপ, ফুলের আদরে দাড়িওয়ালা, বুড়োকবি উপচে উঠতেই বাগানের ছায়ায় লালিত চালাতে কেঁপে উঠল ......

"......ভলাঙ্গশাঙ্গ অনাঙ্গ নতপগ তশ ....

.... ণঙ্গসগ তশ ণঙ্গনগ ণতম্ভ ....."

দিদিমনির দুচোখ বেয়ে নামছে নোনা লাভা।

কবির বুকের খাঁচাতে লুকোনো ছোট্ট "নজরুল" যেন ইঁটভাঁটাতে পেশী ফোলাচ্ছে। জামালের মাথাতে একটার পর একটা ইঁট চড়ছে আর ওর ভিতর থেকে কে যেন বলছে....

"....আমি বেদুইন...

... চেঙ্গিজ...

....বিদ্রোহী ... ক্লান্ত...."

দিদিমণিই শিখিয়েছেন মননে রবীন্দ্রনাথ, চেতনায় নজরুল।

তাইতো ইঁটভাঁটাতে হাতুড়ির ঠকাঠক শব্দের তালে জাগছে...

"....হে নূতন

দেখা ..... আর-বার....

.... শুভক্ষণ...."

DIPUBHAI PALMIST

✲JOYTISHAMART
✲JOYTISHACHARYA
✲JOYTISHRATNA
✲JOYTISHSASTRI
✲SAMUDRIKRATNA
✲SAMUDRIKSIROMONI RATNAVID

Dr. Dipak Kumar Dasgupta

GOLD MEDALIST

SPECIAL AWARD

BHARAT BHUSAN & JYOTISH MAHAMOHAPADHYAYA
Professional Regd. No. EWM - 19200213406984, Licence No: 231/82
Residence : Balaji Mandir Pally, Malancha Road,
P.O: Nimpura, Kharagpur- 4,
Dist. Paschim Medinipur
Consulting Hours: 10 AM To 1 PM
Evening: 5. PM To 7 PM
(Wednesday & Sunday Closed)
By Appointment Only Ph: 253010 (STD - 03222)
Mob.: 9332024000
Appointment Time : 7.30 AM To 8 AM

নাম না জানা হোরমিলার রেল

পল্লব মুখোপাধ্যায়

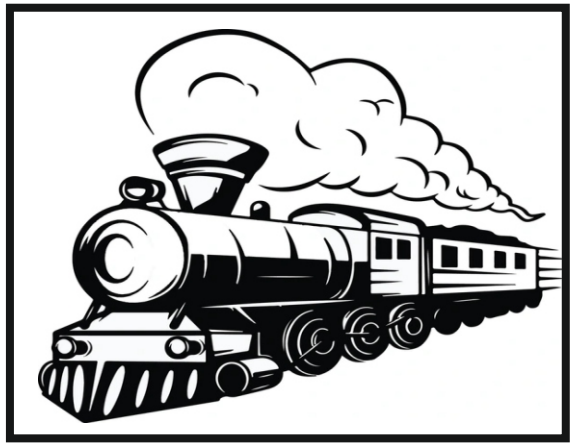

এখন থেকে প্রায় ১৩৭ বছর আগে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি শেওড়াফুলি ও তারকেশ্বরের মধ্যে ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন হওয়া হোরমিলার রেল বা তারকেশ্বর রেলওয়ে কোম্পানির ছোট রেলের এই মানটি বঙ্গমানসে তেমন করে ঠাঁই করে নিতে পারে নি, যেমনটি বঙ্গজীবনকে আপন করে নিয়েছিল মার্টিন রেল। আনুষ্ঠানিক ভাবে ৫ই জানুয়ারি থেকে এই লাইনে রেল চলাচল শুরু হয়। তারকেশ্বরে অবস্থিত বাবা তারকনাথের মহিমা লোকমুখে এত প্রচারিত হয়েছিল যে শুধু বাংলাই নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত সমাগম শুরু হয়। তখন বৈদ্যবাটি থেকে তারকেশ্বরের রাস্তা ছিল যেমন কাঁচা আর তেমনই অত্যন্ত দুর্গম আর ঠ্যাঙারে, ডাকাত অধ্যুষিত। তাদের হাতে বহু তীর্থযাত্রী প্রায় প্রতি বছরই সর্বস্ব খুইয়ে বসতেন। এইসব দেখে ঝকুকশঙ ণতননসশ সপগ ঘকম্মসপস্, যাদের হাওড়ার শালিকায়র (মনসা মঙ্গলে উল্লিখিত শালিখা) কাছে গঙ্গার ধারে ছোট ষ্টীম লঞ্চ তৈরির কারখানা ছিল – যা স্থানীয়দের মুখে মুখে হোরমিলার ডক নামে পরিচতি পেয়েছিল, ঠিক করলো তারকেশ্বরের তীর্থযাত্রীদের যাতায়াত সুগম করতে রেল লাইন পাতা দরকার। সেই মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই বার্তা রটে গেলে ক্রমে। মানুষের উৎসাহও গেল বেড়ে।

রেল লাইন কোথা দিয়ে যাবে তা নিয়ে শুরু হল তীব্র জল্পনা আর বঙ্গ জীবনের অঙ্গ।

মানে আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব তথা দলাদলি। স্থানীয় মানুষদের আশা, আকাঙ্খা, দাবি নিয়ে দু-খানি প্রস্তাব গণদরখাস্তরূপে বাংলার তৎকালীন গর্ভনরের কাছে পেশ করা হলো। জনাইয়ের চৌধুরি পরিবারের উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় মানুষের জোরালো দাবী রেল লাইন হোক জনাইয়ের মধ্যে দিয়ে শিয়াখালা হয়ে তারকেশ্বর পর্যন্ত। অপর পক্ষে উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, শেওড়াফুলি রাজবাড়ির কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র ও কুমার

গিরীন্দ্রচন্দ্র আর হরিপালের বন্দীপুর গ্রামের বাবু নীলকমল মিত্র একযোগে দাবী তুললেন রেল লাইন পাতা হোক শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত। গভর্নরের অবস্থা দিলেন সব খতিয়ে দেখতে যে কোথা দিয়ে রেল লাইন পাতা হলে সর্বাধিক মানুষ উপকৃত হবে এবং কোম্পানির বেশি লাভ হবে।

বর্ধমানের কমিশনের পাশাপাশি হোরমিলার এন্ড কোম্পানি নিজেদের তরফ থেকে নানা রকম জরীপ, নিরীক্ষণ করে দেখলে যে জনাই থেকে শিয়াখালা হয়ে তারকেশ্বর অবধি দূরত্ব ৩৬ মাইল আর শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর অবধি দূরত্ব ২২ মাইল। যাত্রী সংখ্যা কত হতে পারে এবং তা থেকে কেমন আয় হতে পারে তার আন্দাজ পেতে বৈদ্যবাটী তারকেশ্বরের রোডের সংযোগস্থলে চেকপোস্ট স্থাপন করে বুঝতে চেষ্টা করা হল সারাদিন কত লোক পায়ে হেঁটে, তারকেশ্বরের দিক থেকে গোরুরগাড়ি করে কত লোক বিভিন্ন রকম কৃষিজ পণ্য নিয়ে বৈদ্যবাটী হাটে আসে ইত্যাদি ইত্যাদি। বর্ধমানের বিভাগীয় কমিশনার সংগৃহীত এইসব তথ্য সম্বলিত রিপোর্ট এবং শেওড়াফুলি থেকে রেল লাইন পাতলে সার্বিক সুবিধার সুপারিশ করে গভর্নরের কাছে পাঠান। অবশেষে হোরমিলার এন্ড কোম্পানিকে শেওড়াফুলি থেকে

তারকেশ্বর অবধি লাইন পাতার অনুমতি দেওয়া হলে হোরমিলার এন্ড কোম্পানির লোকাল এজেন্ট হিসাবে পূর্ণচন্দ্র সিংহ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অনুমতি তো দেওয়া হলো কিন্তু প্রয়োজনীয় জমির কি হবে ? সে সমস্যা দূর করতে ওই অঞ্চলের জমিদারি থেকে জমি দিয়ে এগিয়ে এলেন উত্ত রপাড়ার জমিদার রাজা জয়কৃষ্ণ মুখার্জী, শেওড়াফুলির জমিদার পরিবারের কুমার গিরিন্দ্রচন্দ্র ও কুমার নরেন্দ্রচন্দ্র তাঁদের জমিদারি থেকে শেওড়াফুলি স্টেশনের জন্য জমি দিলেন, ওদিকে বাবু নীলকমল মিত্র জমি দিলেন নালিকুল স্টেশনের জন্য আর তারকেশ্বরের মোহান্ত মাধব গিরি তারকেশ্বর স্টেশনের ও রেল পথের জন্য জমি দিলেন। প্রস্তাবিত রেলপথের প্রায় পাশ দিয়ে বহে যেত কানানদী, যা বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল ঘন জনবসতিপূর্ণ গ্রামগুলিকে। ফলে প্রস্তাবিত স্টেশনে যাত্রীদের ও কৃষিপণ্যের যাতায়াতের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, এই অন্তরায় দূর করতে বন্দীপুরের বাবু নীলকমল মিত্রের দানে ১০ হাজার টাকা ব্যায়ে কানা নদীর ওপর একটি ব্রিজ তৈরি করা হয় যাতে বহু গ্রামের যাত্রী ও চাষি তাদের কৃষিপণ্য নিয়ে নালীকুল স্টেশনে এসে গাড়ি ধরতে পারে।

১লা জানুয়ারী ১৮৮৪, বেঙ্গলি পত্রিকা ৫ই জানুয়ারি উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কর্মসূচী সম্পর্কে লিখেছিল -"His Excellency The Viceroy has concented to formally inaugurate the new Tarakeshwar Railway on Monday next, the 5th instant. Programme for that day is arranged as follows:-

A Government Steamer conveying Lieutinant Governor and suit will leave the Mayo Ghat at 9 o'clock a.m. and proceed to Barrackpore, where His Excellency will embark for Seoraphuli. His Excellency will leave Seoraphuliby special train punctually at noon for Tarakeshwar, where the ceremony will take place. The special train is expected to reach Trakeshwar about 1.30 p.m. An address will be presented to His Excellency, after which there will be luncheon for the guests, both natives and Europeans. In the the evening there will be a display of fire works for the benefit of the visitors from the district and neighbourhood of the line. The line itself will be informally opened on Thursday next the 1st January. It has been duly inspected and passed by the officers of the railway department of Government. It is expected that special arrangement will be made by the railway authorities for the convenience of such of the general public, who may wish to be present"।

ট্রেন তো চললো কিন্তু ১৮৮৪ সালের ৫ ও ৬ জানুয়ারী হিন্দু পেট্রিয়ট ও বেঙ্গলী পত্রিকার রিপোর্ট বলছে তবে শুরু সেদিন বড় সুখের হয়নি। রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, "একখানা বিশেষ ট্রেন কলকাতা থেকে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সমাজের বিশিষ্টবর্গকে নিয়ে যথাসময়ে তারকেশ্বরে উপস্থিত হয়। তারকেশ্বর স্টেশনের পাশে বিশেষভাবে এক দরবার সভা নির্মাণ করা হয়। ভাইসরয় লর্ড ডাফ্রিন ও বাংলার গর্ভনরসহ উপস্থিত বাংলার বিশিষ্ট, সেই বিশেষভাবে নির্মিত তাঁবুর মধ্যে আসন গ্রহণ করলে প্রথমে মিঃ মিলার কোম্পানির পক্ষে স্বাগত ভাষণ দেন। তারপর মাননীয় গভর্নর জেনারেল ও বাংলার গভর্নর বাবা তারকনাথ দর্শনে যান। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বাবা তারকনাথের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বহু প্রশ্ন করেন এবং তিনি যথাযথভাবে সব উত্তর দেন। অতঃপর সকলে তাঁবুতে ফিরে আসেন কিছু বিশ্রামের জন্য। এই অবধি সব ঠিকঠাক ছিল। বিকেল ০৩.৩০ মিনিটে বিশেষ ট্রেন তারকেশ্বর থেকে ছাড়ার কথা। হাইকোর্টের বিখ্যাত ব্যারিস্টার পি সি সেন, শোভাবাজার রাজ বাড়ির কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব, জাতীয়তাবাদী নেতা গণেশচন্দ্র , মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কুমার নীলকৃষ্ণ, রাজা জয়কৃষ্ণ মুখার্জী রাজা নীলকমল মিত্র, কুমার নরেন্দ্র চন্দ্র ও কুমার গিরিন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি ট্রেনে এসে বসেন। এমন সময় হুগলীর ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট অব পুলিশ

জনৈক মিঃ বেকার সমস্ত ভারতীয়দের ট্রেন থেকে নেমে যেতে বলেন। কিন্তু কোনও ভারতীয় ট্রেন থেকে নামেননি। তখন মিঃ বেকার পুলিশ কনস্টেবলদের ডাকেন ও নির্দেশ দেন জোর করে ভারতীয়দের ট্রেন থেকে নামানোর জন্য। এই অপমানজনক ব্যবহারে সমস্ত ভারতীয়গণ ট্রেন থেকে নেমে পড়েন। এমন সময় ভাইসরয় লর্ড ডাফ্রিন ট্রেনে ওঠার জন্য আসেন। তিনি সমস্ত সম্মানীয় ভারতীয়দের এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করেন কি ব্যাপার, তখন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁদের অপমানের কথা বলেন এবং প্রতিকারের দাবি করেন। ভাইসরয় বাংলার গর্ভনরকে ডেকে সমস্ত বিষয় জেনে ব্যবস্থা নিতে আদেশ দেন। গভর্নর সমস্ত শুনে মিঃ বেকারকে সম্মানীয় ভারতীয়দের কাছে ক্ষমা চাইতে আদেশ দেন। অতঃপর মিঃ বেকার সকলের কাছে ক্ষমা চান ও করমর্দন করেন। এরফলে সেদিন ট্রেন ২৭ মিনিট লেট হয়েছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে সেদিন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বিদেশী পুলিশের অপমানের যথাযথ উত্তর তারকেশ্বরে দাঁড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। যদিও ১লা জানুয়ারি ওই লাইনের যাত্রী ট্রেন চলাচলের উদ্বোধন হয় কিন্তু ১৮৮৪ সালের ৫ জানুয়ারী থেকে এই রেলপথ সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। জনগনের অলগতির জন্য ১৮৮৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর হোরমিলার এন্ড কোম্পানি এক বিজ্ঞাপন মারফৎ জানায় যে ওই বছরের ১লা জানুয়ারি থেকে শেওড়াফুলি ও তারকেশ্বরের মধ্যে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। যাতায়াতের পথে ট্রেনগুলি যাত্রী ওঠানামার জন্য অন্তর্বর্তী চারটি স্টেশনে থামছে। স্টেশনগুলি হল যথাক্রমে - গোবিন্দপুর (এখনকার দিয়াড়া), সিঙ্গুর, নালিকুল, হরিপাল। পরবর্তীকালে যাত্রী সুবিধার্থে এই রেলপথে ক্রমে ক্রমে নশিবপুর, কামারকুন্ডু, কৈকালা ও লোকনাথ স্টেশন চালু হয়। ওই বিজ্ঞাপন থেকে আরও জানা যায় যে শেওড়াফুলি ও তারকেশ্বরের মধ্যে ফার্স্ট ক্লাসের যাতায়াতের ভাড়া ছিল চোদ্দ আনা তিন পয়সা আর তৃতীয় শ্রেণীর যাতায়াতের ভাড়া ছিল পাঁচ আনা দুই পয়সা। ব্যাপারি ও কৃষকদিগের ভাড়া ছিল এগারো আনা। প্রতি ব্যাপারি ও কৃষক বিনা মাশুলে দেড় মন পর্যন্ত মাল নিয়ে যেতে পারতেন। তার বেশি ওজন হলে মাইল প্রতি তিনের চার পাই অতিরিক্ত মাশুল দিতে হতো।

হোর মিলার এন্ড কোম্পানি যখন রেল লাইন পাতার কাজ দ্রুতসম্পন্ন করতে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন ২৯ শে এপ্রিল, ১৮৮৪ কলকাতার দ্য স্টেটসম্যান সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখল-"It seems strange and anomalous that the line should stop on the side of the Damodah Why should it not be extended to Jehanabad? And why should the vast fertile and neglected though densely populated country in the north of Midnapore district be left destitute of all access to all access to the railways? This a question which the Government of Bengal should at one consider consider" । সেদিনের সেই সম্পাদকীয় স্তম্ভের লেখা আশু ফল ফলপ্রসু না হলেও প্রায় ১২৬ বছর পর তারকেশ্বর থেকে আরামবাগ এই সা ড়ে চব্বিশ কিলোমিটার দূরত্ব রেল পথ দিয়ে পর্যায়ক্মে যোগ করা হয়। ২৫শে এপ্রিল ২০১০ প্রথম পর্যায়ে তারকেশ্বর থেকে তালপুর পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার রেলপথের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় এবং ২০১২ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই প্রকল্পের যথা সম্পর্ণ হয়ে যায়। তারকেশ্বর থেকে আরামবাগের মধ্যে তিনটি স্টেশন যথা তালপুর, টাকিপুর ও মায়াপুর। দামোদর, মুন্ডেশ্বরী, কানা দ্বারকেশ্বর এই তিনটি নদী আর চারটে খালের ওপর ব্রীজ দিয়ে যখন ঝমঝম করে ট্রেন চলে যায় তখন বিখ্যাত হিন্দী কবি দুষ্মন্তের কবিতার সেই অসামান্য লাইগুলো মনে পড়ে যায় –

"এক জঙ্গল হ্যয় তেরি আঁখো মে
যাঁলা ম্যয় রাল ভুল যাতা, হুঁ,
তু রেলসি নিকল যাতি হ্যয়
ম্যয় পুলসা থরথরতা হুঁ।"

সব শিক্ষাই মূল্যবান

ড. শুভেন্দু বিকাশ চক্রবর্ত্তী

বাংলায় 'ভোকাট্টা'– শব্দটার কোন আভিধানিক অর্থ না মিললেও, ঘুড়ি উড়াতে গিয়ে ঘুড়ি কেটে দিলে চিৎকার ওঠে 'ভোকাট্টা' অর্থাৎ কেটে গেল। ভোকাট্টা গুজরাটিতে হলো 'কায় পোছে'। এখানে গুজরাটীতে বলার কারণ হলো ঘুড়ি ওড়ানো উৎসব গুজরাট, কাঠিরাবার (কচ্ছরান) প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে এর ব্যাপক প্রচলন। পৌষ সংক্রান্তি বা মকর সংক্রান্তিতে এই ঘুড়ি ওড়ানো উৎসবে সবাই মাতোয়ারা। আমরা যাকে উত্তরায়ণ বলি এরা বলে 'উত্তরান' – এখানে অফিস কলকারখানা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকে। এই উত্তরাণ মানুষের কাছে উত্তরোত্তর খুশির বার্তা বহন করুক। সকলে খুশি হোক। তাই ঘুড়ি ওড়ানো তাদের কাছে খুশির উৎসব। তাদের বিশ্বাস মানুষের জীবন ঘুড়ির মত বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে দিয়ে সর্বোচ্চ জায়গা আকাশে অবস্থান করুক। সকলের শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক ঘুড়ি ওড়ানো উৎসব সেই বার্তা বহন করুক।

'পৌষ সংক্রান্তি' ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। বাংলায় পৌষ পার্বণ, দক্ষিণ ভারতে- পোঙ্গল, পাঞ্জাবে - লহরী, গুজরাটে - উতরাণ, পৌষ মাসকে – মল মাস বলা হয়, কারণ এ সময় কোন অনুষ্ঠান বা শুভ কাজ করা হয় না। পশ্চিমবাংলায় পৌষ সংক্রান্তিকে লক্ষ্মী মাস এই পৌষ মাসকে ধরে রাখতে রাত্রে পৌষ বন্দনা করা হয়।

গুজরাটে পনের দিন আগে থেকে ঘুড়ির বিচিত্র সম্ভার নিয়ে খেলার মতো সারা সুরাট নগরীতে ঘুড়ির লাটাই, ও সূতোর দোকান বসে। ছেলে, বুড়ো সকলে এ উৎসবে যোগ দেয়। প্রতি একশ মিটার সূতো পঁচিশ টাকায় বিক্রি হয়। সুতোয় মাঞ্জা দেওয়ার মেশিন বসানো হয়েছে। এই মাঞ্জাদিতে প্রতি একশ মিটার সূতোর জন্যে পঞ্চাশ টাকা দিতে হচ্ছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুড়ির বাজার চলছে। বহুদামী ঘুড়ি বিক্রি হচ্ছে, চার-পাঁচ হাজার টাকা দামের ঘুড়িও পাওয়া যাচ্ছে। এই দামী ঘুড়ি সাধারণতঃ যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে ও যারা সারা বছর ঘুড়ি ওড়ানো অভ্যেস করে তারা কেনে। ঘুড়ি ওড়ানোর মধ্যে দিয়ে সকলে অপরিসীম আনন্দ পায়। দেহের কোন অংশ এমনকি গলা যাতে রক্ষা পায় মাঞ্জা দেওয়া সূতোর হাত থেকে, তাই মোটর বাইক, বাইক প্রভৃতিতে হ্যান্ডেলের উপর তিনদিক ঘেরা দু'ফুট উঁচু মোটা তারের বেড়া দেওয়া থাকে। অবাক হয়ে কৌতূক সহকারে একটা ঘুড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে একজন বাঙালী তন্ত্রলোক সেটা পরীক্ষা করছে। হর্ষ এগিয়ে এসে বললে– সুজয়া করেছো ?পাশেই দাঁড়িয়ে অন্বয় চ্যাটার্জী যে ছেলেটি গুজরাটি ভাল জানে অথচ সে বাঙালী। সে হাসিমুখে বললে বাঙালী ভদ্রলোককে ও বলছে – কি দেখছেন ? তিনি হেসে বললেন– এটা দেখে ভাবছি, এর কারণটা কি ? অন্বয় বললে– ঘুড়ির সূতোয় মাঞ্জা দেওয়া হয় কাঁচের গুড়ো দিয়ে। স্পীডে গাড়ী যাওয়ার সময় গলা কেটে যাওয়া থেকে বাঁচবার জন্যে মোটা তার দিয়ে হ্যান্ডেলের উপর তিনটে দিক বন্ধ করা। এ সতর্কতা তার জন্যে। বাঙালী ভদ্রলোক অন্বয়ের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে লাগলো। সে কথার মাঝে ভদ্রলোককে বললে – যে ছেলেটি আপনাকে জিজ্ঞেস করলো, তার কথা একটু শুনুন ওকে দোকানে রাখতে এখানকার ঘুড়ির দোকানের মালিক অনেক দিন আগে থেকে ওর জন্যে হন্যি হয়ে ঘোরে।– কেন ? ছেলেটার এত কদর কিসে ?– ছেলেটা খুব গরীব। কিন্তু এ শহরে ঘুড়ি ওড়াতে ওর জুড়ি মেলা ভার। যারা ঘুড়ি ওড়ায়, তারা ওর কাছেই আসে ঘুড়ি, সূতো, লাটাই কিনতে। সে জানে কোন ঘুড়িটা ভাল হবে, কোন মাঞ্জা দিলে সূতো শক্ত-পোক্ত হবে। কোন কায়দায় তারা ঘুড়ি ওড়াবে, এগুলো তার কাছে জেনে নেয়। এজন্যে ছেলেরা ঘুড়ি, সুতো কেনবার জন্যে এই দোকানে ভীড় জমায়। অন্বয়ের কথা শুনে ভদ্রলোকটি অবাক হচ্ছেন আর বলছেন –

তোমার কথা শুনে ছেলেটার উপর আমার আকর্ষণ বেড়ে চলেছে। সন্ধ্যে যতই ঘনিয়ে আসছে, ততই ঘুড়ির দোকানে ভীড় বেড়েই চলেছে। হর্ষ প্যাটেল কে নিয়ে ছেলেরা টানাটানি করছে। কেউ বলছে কোন ঘুড়ি নেবে, কেউ বলছে কি মাঞ্জা দেবে সুতোয়। আজ হর্ষ প্যাটেল যেন হিরো। বড় ছেলেরাও তার কাছে জিজ্ঞেস করছে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ। অন্বয়ের সঙ্গে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দেখে চলেছেন ঘুড়ির মাঞ্জা। রাত্রি এগারটা পর্যন্ত বিক্রি-বাট্টা সেরে দোকান গুটাতে ব্যস্ত। দোকানদার জানে হর্ষ মজুরী বাবদ টাকা চায় না, সে চায় মনমতো ঘুড়ি, লাটাই ও সূতো। এগুলো কেনার তার সামর্থ্য নেই, কিন্তু ঘুড়ি সে ওড়াবেই– ওড়াবে। মালিক আজ বহু টাকার মাল বিক্রি করেছে। সে হর্ষের উপর খুব সন্তুষ্ট। আসলে তার মুনাফা যা হয়েছে তা যে হর্ষের জন্যেই। তাই হর্ষকে জড়িয়ে ধরে বললে – তোমার যে জিনিস নিতে ইচ্ছে করে সেটা নাও। কোন লজ্জা করবে না। হর্ষের তিন রঙের সূতো ভর্ত্তি লাটাই আর কিছু ঘুড়ি চাই। সেটা বলার পর মালিক বললে– তোর ইচ্ছে মত যা নিবি নিয়ে নে, আর জামা-প্যান্ট কেনার টাকা নিবিনে ? হর্ষের লক্ষ্য টাকা নয়, ঘুড়ি। তাই সে বললো– যা দেবেন দিন না, বলে ঘুড়ি বাছাই করতে লাগলো। সে এর জন্যে কয়েক দিন ধরে পরিশ্রম করে চলেছে। এক মনে সে লাটাই সূতো, ঘুড়ি বাছাই করছে এমন সময় মোটর বাইক চেপে এল কয়েকটা ছেলে – হর্ষ শোন্ একবার। হর্ষ মালিকের মুখের দিকে চাইলো, মালিক ইশারায় তাকে যেতে বললো, ছেলেটা এগিয়ে গেল, পাশে অন্বয় ও ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ঐ ছেলেগুলোর সঙ্গে হর্ষের গুজরাটিতে যে কথা হলো অন্বয় বললে– ছেলেগুলো চার হাজার টাকা দামের ঘুড়ি কিনেছে, সেগুলো ওড়াতে হর্ষকে নিয়ে যাবে কাল। হর্ষ এমনি ঘুড়ি ওড়ানোর কারিগর। মালিক বললে– ওদের বাড়ি গিয়ে ওর বাপ-মার সঙ্গে কথা বলতে। তারা রাজী হয়ে হর্ষকে নিয়ে গেল ওদের বাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা হর্ষকে নিয়ে দোকানে এল। মালিক বললে– বাড়িতে কি বললো ? হর্ষ বললে– কাল সকাল থেকে সে ওদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়াবে। ওরা ওর মাকে এক হাজার টাকা দিয়েছে, হর্ষকে নিয়ে যাবার জন্যে। তাই সে দোকানদারকে কাল দোকানটা চালিয়ে নিতে বললো। দরদী দোকানদার বললে– কোন চিন্তে নেই, তুই যা, যা বিক্রি হবার আজকে হয়েছে, আমি দোকান চালিয়ে নেব। রাত্রি অনেক হলো, এবার হর্ষ বাড়ী যাবে, দোকানদার তার হাতে তার পছন্দের ঘুড়িগুলো, লাটাই, সূতো তুলে দিয়ে এক হাজার টাকা তার পকেটে ভরে দিল। দোকানদার আনন্দিত হয়ে বললে– হর্ষ প্যাটেল আওতা বর্ষে পাছু থসে– অর্থাৎ আসছে বছর আবার হবে। এবার অন্বয় চ্যাটার্জ্জী বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে বসলে চলুন বাড়ী যাই। ভদ্রলোক বললে– অন্বয় আমি কিভাবে হর্ষের ঘুড়ি ওড়ানো দেখতে পাব। অন্বয় বললে- চিন্তে করবেন না, আমি কাল ওদের বাড়ি আপনাকে নিয়ে যাব। আপনাকে দেখাবো। কাল সকালে এখানে আসবেন।

আজ চৌদ্দ জানুয়ারী মকর সংক্রান্তি - উতরান, হর্ষ খুব সকালে উঠে অপেক্ষা করছে। তার বাড়ির সকলে খুব আনন্দিত। মা বললে– ছাদের ধারে যেন যেওনা। ওরা শেঠ, ওরা যা বলে তাই শুনো। ওরা গরীবদের হীন চক্ষে দেখে। জীগনেশ দেশাই বলে কালকের ছেলেটা হর্ষকে মোটর বাইকে চাপিয়ে নিয়ে গেল। তাদের বাড়ীর ছাদে। ততক্ষণে অন্বয় ভদ্রলোকটিকে নিয়ে গেছে ঘুড়ি ওড়ানো দেখাতে। শেঠজী অন্বয়ের কথা শুনে তাদের এই আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে বললেন। শেঠজী মতিলাল দেশাই এর একমাত্র পুত্র জীগনেশ। শেঠজীর দুটো কাপড়ের মিল রয়েছে। বিশাল এলাকাজুড়ে বাড়ী। শখ্ তাদের জন্মগত অধিকার। হর্ষের কোনদিকে লক্ষ্য নেই, সে তার নিজের দক্ষতায় রাজপথ থেকে এসে উঠেছে রাজবাড়ীতে। চার হাজার টাকা দামের ঘুড়ি সে কোনদিন ওড়ায়নি। তার গর্ব নেই, আছে তার একাগ্রতা ও নিষ্ঠা। আজকের ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতায় হর্ষের হাত দিয়ে জীগনেশকে জিততেই হবে। সে যে বন্ধুদের বড় মুখ করে বলেছে।

ধনীলোকের বাড়ীর ছাদ– অবাক হওয়ার মত। হর্ষের কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। বাড়ীর মেয়েরা

বিশেষভাবে সাজ-সজ্জা করে ঘুড়ি ওড়ানো উৎসবে সামিল হয়েছে। সবাই আনন্দে বিহ্বল। জীগনেশের ইচ্ছে যে, ঘুড়ি ওড়ানোটা শুরু হোক চার হাজার টাকার ঘুড়ি দিয়ে। হর্ষ নিজের প্রতি আস্থাশীল তাই কোনরকম ভয় তার নেই। এজ্যেই তাকে বলা মাত্র, লাটাইটা কপালে ঠেকিয়ে দামী ঘুড়ি দুটোর মধ্যে থেকে একটাকে বেছে নিয়ে মুক্ত মন নিয়ে মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দিল তার যুদ্ধজয়ী ঘুড়ি। জীগণেশ এর বাবা মতিলালের কৌতূকের সীমা নেই। ছেলেটির এত মনের জোর। নিজের মনের জোরে সে চার হাজার টাকার ঘুড়ি আকাশে ওড়ালো। সকলের দৃষ্টি ঐ ঘুড়িটার দিকে। হর্ষ আকাশে উড়ন্ত ঘুড়িগুলোকে এক এক করে কেটে চলেছে। সকলের সে কি আনন্দ, কি উল্লাস। কিন্তু হর্ষ স্থির দৃষ্টিতে সে লক্ষ্য পথে চলেছে। তার দৃষ্টি আকাশে নিজের ঘুড়িটার দিকে। সে প্রায় একশ ঘুড়ি কেটেছে। বেলা অনেক হয়েছে, মতিলাল হর্ষকে বললে– এবার কিছু খেয়ে নে। হর্ষের উত্তর– না, বাবু সন্ধ্যে ছাড়া কিছু খাব না। একটু অন্যমনস্ক হলে ওরা আমার ঘুড়িটা কেটে দেবে। মতিলাল অবাক হয়ে দেখছেন–ছেলেটার কি নিষ্ঠা। কি একাগ্রতা। তিনি ভাবছেন– এছেলে অনেক বড় হবে। প্রতিযোগীতায় সে জয়ী হবেই। ছাদে ছেলেদের ভীড় বড় কম নয়। হর্ষের দৃষ্টি তার ঘুড়ির দিকে। হঠাৎ একটা দামী ঘুড়ি উড়ে এল তাদের ছাদের মাথায়, হর্ষ তার ঘুড়িটাকে নীচে এনে উড়ে আসা ঘুড়িটাকে একটা প্যাঁচ দিল। পলকের মধ্যে ঐ উড়ে আসা ঘুড়িটা কেটে গেল। হর্ষ ও জীগণেশ চিৎকার করে উঠলো– কায় পোছে– কায় পোছে। অর্থাৎ ভোকাট্টা, ভোকাট্টা। ছাদের উপরে সকলেই এসে জড়িয়ে ধরছে হর্ষ প্যাটেলকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। হর্ষ ও জীগণেশ আনন্দে চিৎকার করছে। হর্ষ তার ঘুড়িটাকে নামিয়ে এনে ফানুস উড়িয়ে দিল। জীগণেশের মা গরীবের ছেলে হর্ষকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন– তুই প্রতিদিন জীগণেশ এর সঙ্গে খেলতে আসবি। জীগণেশ বললে– মা, ওরা যে বড় গরীব। ও কাজ করে দোকানে। এদিকে মিলমালিক, মতিলাল দেশাই রূপের থালায় তার জন্যে খাবার হাতে দাঁড়িয়ে আছে।– নে খেয়ে নে বাবা, সারাদিন কিছু খাসনি। হর্ষের চোখের সামনে তার মায়ের মলিন মুখটা ভেসে উঠলো । তার হাতে মতিলাল খাবারের থালাটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন– আমি তোর মা-বাবাকে বলবো আজ থেকে তোর সমস্ত দায়িত্ব আমি নিলাম। তুই এখানে জীগণেশ এর বন্ধু হয়ে থাকবি। অন্বয়ের সঙ্গে ভদ্রলোকটি চশমা খুলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে, মুছতে নীচে নামলো। মুখে বলল সব শিক্ষাই মূল্যবান।

ক্রমবর্ধমান বিদ্যুতের ঘাটতি ও খরচের হাত থেকে বাঁচুন –

"সৌরবিদ্যুত"

এর ব্যবহার শুরু করুন ।

সৌরবিদ্যুতের সংযোগ ব্যবস্থা ও সমস্ত রকম উপকরণ

(সোলার প্লেট, ব্যাটারী, UPS , পাখা, লাইট ইত্যাদি)

আমাদের কাছে পাবেন সম্পূণ ভাবে পরিষেবা সহ ।

জানা কেবল নেটওয়াক

লোয়াদা ○ পশ্চিম মেদিনীপুর

মো: 9732556764/9732040073

যোগা-ক্লাশে যাওয়ার আগে সামান্য টিপস্

অচিন্ত মারিক

কোনো যুক্তিই অবৈজ্ঞানিক নয়, এমন ধারনা পোষণ করতে হলে, মুক্তির কথা সবার আগে বলতেই হবে – মুক্তির অর্থ অজ্ঞান থেকে মুক্তি, অহংকার থেকে মুক্তি, হিংসা থেকে মুক্তি। মুক্তিই যোগের একমাত্র ও শেষ পরিপূরক। তবে তার আগে যোগ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথমেই বলে নিই, যোগ শব্দটিকে গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে চলবে না - সমস্ত পুরাতন অভ্যাস, গতানুগতিক অন্ধসংস্কার থেকে অব্যহতি নিয়ে যোগ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে হবে।

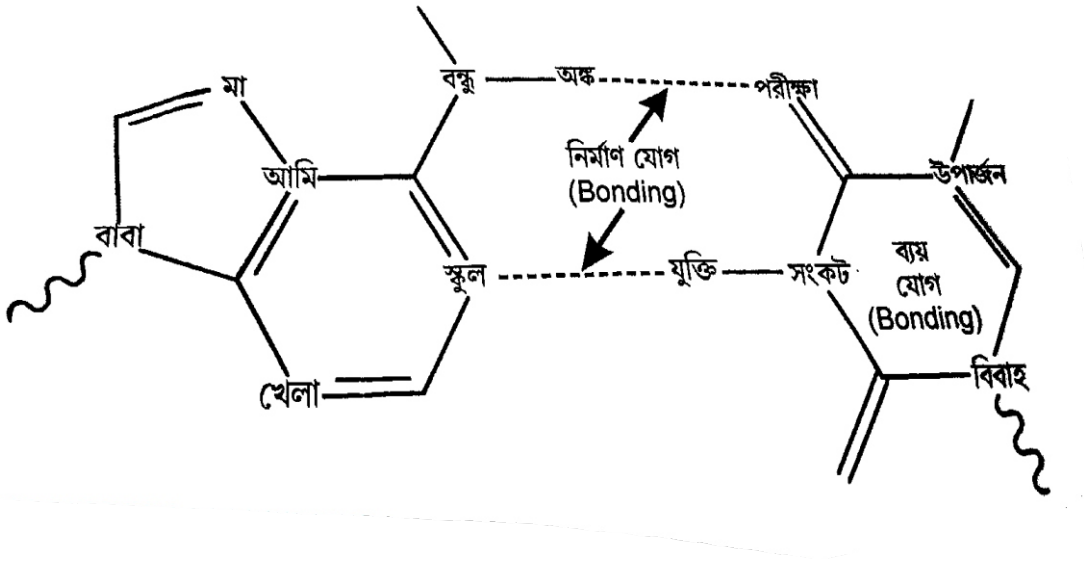

যোগ চাইছে মনুষ্যপ্রভাব থেকে মুক্ত হও, দেবপ্রভাবে বিভোর হও । অপর দিকে বিজ্ঞান চাইছে সমস্তপ্রকার যোগপ্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে মানুষকে। ত্যাগের দ্বারাই নাকি ভোগকে চিনে নিতে হবে। আশ্চর্য! তাহলে জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ, প্রেম, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য কি ভাবে পূর্ণতা পাবে ? যোগ বলছে বৈরাগ্য হল সব জ্ঞানের আরম্ভ ও শেষ। এ যেন হিন্দি সিনেমা, কিশোর কুমারের গান দিয়ে শুরু, আর তার গান দিয়ে সিনেমা শেষ। বৈরাগ্য সুস্থতার লক্ষ্মণ নয়, মনের একটি সাময়িক বিকার অবস্থা। সাধনা বা তপস্যার কোনো পর্যায়েই এর প্রয়োজনীয়তা নেই। মন যখন বিষয়ের সংস্পর্শে আসে, তখন জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হতে থাকে। প্রকৃতির সহজসিদ্ধ নিয়মবশে মানুষ চলাফেরা করে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ বর্জন করে তাই যোগের অন্তঃস্থ অদম্য শক্তি মানুষকে তেমন প্রভাবিত করতে পারে না। আবার যদি বৌদ্ধভাবের ভাবুক হয়ে বলি, জগৎ মানেই দুঃখ - তখন নির্বাণ এসে জড়িয়ে ধরবে পার্থিব শরীরকে, আর জীবন তার নির্মাণের কথা ভুলে গিয়ে দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। এ কোন্ যুক্তি, এ কোন্ জ্ঞান আমি বুঝে পাই না। আমি কখনই স্বীকার করব না, জীবন একটা ঘোর দুঃস্বপ্ন, শূন্যগর্ভ মরীচিকা! আমার নিজের উপলব্ধি আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে সৃষ্টি কি মহৎ সত্য, কি শাশ্বত আনন্দে তার প্রতিষ্ঠা, কি গভীর জ্ঞানে তা বিস্তৃত। আসলে আসক্তিহীন মানুষ মানেই নিষ্কর্মা। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, – "জগতে কেহ বা কর্মশিক্ষা দেয়, কেহ বা নৈষ্কর্ম শিক্ষা দেয়, আমি কিন্তু যারা নৈষ্কর্মশিক্ষা দেয় সেই দুর্বলচেতাদের মতাবলম্বী নই।"

যোগ শব্দ থেকে প্রাপ্ত যৌগিক সাধনা এক প্রকার প্রক্রিয়া। নির্দিষ্ট রীতিতে শ্বাসগ্রহণ, শ্বাসধারণ ও শ্বাসত্যাগ করা হলো এক প্রকার সাধনা - এটি যোগা নামেও পরিচিত। এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য শব্দগুলি হল যোগাভ্যাস, যোগনিদ্রা, যোগদান, যোগাযোগ, যোগারূঢ়, যোগাসন. যোগবিদ্ ইত্যাদি। আর একটি শব্দ 'যোগাকর্ষণ' অসম্ভব গূঢ় অর্থ বহন করে অর্থাৎ যোগ দ্বারা

আকর্ষণ। যে গুণ দ্বারা পরমাণুগুলি একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে তারই নাম যোগাকর্ষণ। যোগব্যায়ামের সময় হাতে যে মুদ্রা রচনা করা হয়, তার সাথে রসায়নের বন্ডিং-এর দারুন মিল। এই বন্ডিং হল পরমাণুর সাথে পরমাণুর পরস্পর যুক্ত থাকার বন্ধন। দুটি বন্ডিং চিত্র দিয়ে যোগ বা যোগার চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একটি শিশুসন্তান কিভাবে বাবা-মা, স্কুল-অঙ্ক, খেলা-সংকট, উপার্জন-বিবাহ ইত্যাদি অবস্থাগুলি নিয়ে একটি নিখুঁত রাসায়নিক বন্ধন চরিত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তার হাইপোথিসিস রচনা করা হয়েছে। আবার আত্মযোগ (বা পঙ্কচ গকপগতপড়) কিভাবে একটি রাসায়নিক ইকুয়েশনের মতো পরস্পর পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত হয় তাও একটি চিত্রে দেখানো হয়েছে। যোগের মাধ্যমে যে সকল বিক্রিয়া আত্মযোগ বন্ধনটি সম্পুর্ণ করতে সাহায্য করেছে সেগুলি চিত্রে যেমন দেখানো হয়েছে সেভাবেই অংশগ্রহণ করে।

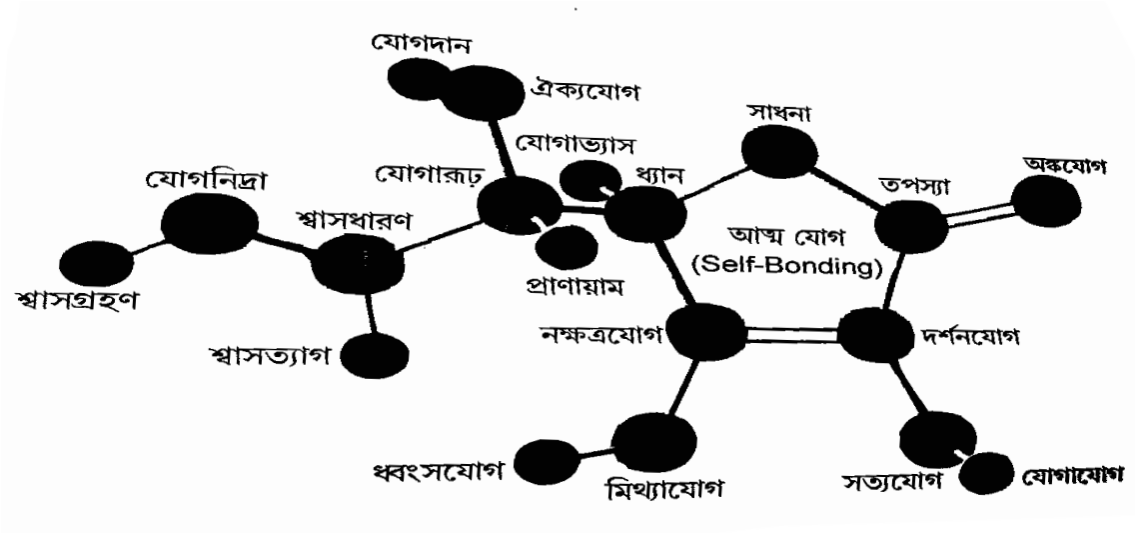

আর একটি কথা, যোগের উদ্দেশ্য অনন্ত শক্তিমান হওয়া নয়। আবার আত্মার সাথে আত্মার পারলৌকিক সম্পর্ক স্থাপনও নয়। যোগ অনুশীলন সাধারণ অঙ্কের মতই অনন্ত সমষ্টি রচনা করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তর্ক দিয়ে উত্তর খুঁজতে গেলে যুক্তি শ্রদ্ধাবানের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে। তাই প্রকৃত 'আমি'র খোঁজে বৃহত্তর 'আমি'র পেছনে দৌড়ে কি লাভ বলুন ? এবং সেটাই যোগের আসল উদ্দেশ্য।

ঋণ—

১. সূর্য সাধনা ও প্রাণায়াম শিক্ষা - মণি ধর - ১৯৩৫ ২য় সং

২. The Yoga And Its Object - Sri Aurobindo, 1921

৩. Introduction Yoga - Annie Besant, 1908

৪. KARMA-YOGA, Ed. 1st, SWAMI VIVEKANANDA, 1901, Unbodhan, Kolkata

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণ

দেবীপ্রসাদ ত্রিপাঠী

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগরণে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী ও সমাজ সংস্কারক অগ্রগণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান দুইজন হলেন রাজা রামমোহন রায় ও পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। প্রথমে আমরা রাজা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে আলোচনা করব। রাজা রামমোহন রায় কিন্তু বংশানুক্রমে রাজা নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষের মুকুটহীন রাজা, যাঁর প্রজাবৃন্দ সমস্ত ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী মহল এবং অগণিত নিষ্পেষিত নারী সমাজ। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহ রামমোহন রায়কে 'রাজ্য' উপাধি দান করেছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকারও তাঁর এই রাজা উপাধির মান্যতা দান করেছিলেন। বাঙ্গালীকে আধুনিক মননে তিনিই চিন্তা করতে শিখিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন 'এদেশের প্রথম আধুনিক মানুষ'। বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর মধ্যে তিনি সতীদাহর মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কুৎসিত, বর্বরোচিত প্রথার বিলোপ সাধন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সতীদাহ প্রথার পিছনে ছিল একশ্রেণীর স্বার্থান্ধ কুলীন ব্রাহ্মণদের মদত যারা অজ্ঞ, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষজনকে শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা দিয়ে এই প্রথা চালু রাখার পক্ষে দৃঢ়মত ব্যক্ত করতেন।

এই কুলীন ব্রাহ্মণ কাদের বলা হত। যে সমস্ত ব্রাহ্মণের মধ্যে আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ দর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ ও দান - এই নয়টি গুণ বিদ্যমান থাকত তারাই হলেন কুলীণ ব্রাহ্মণ। কিভাবে সমাজে তাদের সৃষ্টি হল সেই প্রসঙ্গে জানতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে একাদশ শতাব্দীতে। বিধি নিষেধের বাঁধন সর্বাঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে সমাজকে যিনি ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন তার নাম রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। মনুর মত রঘুনন্দনও অষ্টবিংশতি তত্ত্বের যেসব সামাজিক কৃত্যের বিধান দিয়েছিলেন তার পিছনে না ছিল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, না ছিল কোন যুক্তি।

সতীদাহের মতো বীভৎস প্রথার বিরুদ্ধে একাকী গর্জে উঠেছিলেন রামমোহন রায়। জনমত সংগ্রহের জন্য কলকাতার প্রতিটি বাড়িতে গেলে তাঁকে দেখে বাড়ির দরজা মুখের উপরে বন্ধ করে দেওয়া হতো সমাজের ব্যবস্থাপকদের বিষনজরে যাতে পড়তে না হয়। কিন্তু রামমোহন ছিলেন বড়ই একগুঁয়ে ও জেদী। তিনি বেদ, পুরাণ, মনুসংহিতা ঘেঁটে বের করলেন সতীদাহ অশাস্ত্রীয় প্রথা। ইংরেজ বড়লাটের কাছে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা পেশ করলেন। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করলেন। তাদের ভয়ে বড়লাট হেস্টিংস পিছিয়ে গেলেন। রামমোহন এতে দমে না গিয়ে শুরু করলেন বৃহত্তর লড়াই। ১৮১৮ সালের শেষার্ধে রামমোহন সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সংবাদ পুস্তিকা প্রকাশ করলেন এবং পরে তার ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশ করলেন। আধুনিক চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি এক নতুন ধর্ম মতের উপস্থাপনা করলেন। যার মূল চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একেশ্বরবাদ। ব্রাহ্মধর্মের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একে একে তাঁর পতাকাতলে জড়ো হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারকনাথ গাঙ্গুলী প্রভৃতিরা। উনবিংশ শতকে শিক্ষা ও স্ত্রী বিস্তারে এইসব মানুষেরা এগিয়ে এলেন। ডেভিড হেয়ার এই সময়ে হেয়ার স্কুল, হিন্দু কলেজ গড়ে তুললেন এবং রামমোহন তাঁকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করলেন। এর পরেই ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক, যিনি ছিলেন উদার ধর্মমত, আধুনিক চিন্তাধারামনস্ক এবং কুসংস্কারবিরোধী। রামমোহন তাঁর কাছে যেয়ে আবেদন করলেন সতীদাহের মত বর্বরপ্রথা চিরতরে বন্ধ করার জন্য। বিশাল জনসমর্থন নিয়ে রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাধাকান্ত দেবও হাজির হলেন সেখানে। কিন্তু লর্ড বেণ্টিঙ্ক রামমোহনের মতকে সমর্থন করে ১৮২৯ সালের ৪ঠা

ডিসেম্বর আইন করে সতীদাহপ্রথা বন্ধ করে দিলেন।

এই আইনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব ইংল্যান্ডে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করলেন যাতে এই আইন বন্ধ করা হয়। রাজা রামমোহন রায়ও প্রিভি কাউন্সিলে যেয়ে শাস্ত্রের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করলেন। তিনি প্রিভি কাউন্সিলে যেয়ে প্রমাণ করলেন বেদে কোথাও সতীদাহের উল্লেখ নেই, বরং স্বামীর মৃত্যুর পরে পুনর্বিবাহের ব্যাপারে তারা মত দিয়েছেন। অথর্ববেদে (১৮.৩.১) বলা হয়েছে "ইয়ং নারী পতি লোকং বৃণানা নিপদ্যত উপত্ব্য মন্তৎ প্রেত্রম। ধর্মং পুরানমণু পালয়ন্তী তস্মৈ প্রজাং দ্রবিনং চেহ ধেহি"।। অর্থাৎ হে মনুষ্য। এই স্ত্রী পুনর্বিবাহের আকাঙ্খা করিয়া মৃত পতির পরে তোমার নিকট আসিয়াছি, সে ধর্মকে পালন করিয়া যাতে সন্তানদি এবং সুখ ভোগ করিতে পারে। অথর্ববেদের এই মন্ত্রটি ঋকবেদেও (১০.১৮.৮) আছে এইভাবে - "উদীষর্ব নার্য্যাতি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ ত্রহি। হস্তাগ্রতস্য দিবিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমতি সংবভূব।।" এর অর্থ হল - হে নারী। মৃতপতির শোকে অচল হয়ে লাভ কি ? বাস্তব জীবনে ফিরে এসো। পুনরায় তোমার পাণিগ্রহণকারী পতির সাথে তোমার আবার পত্নীত্ব তৈরি হবে। বেদের অন্যতম ভাষ্যকার সায়নাচার্যও তাঁর তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্যেও এই মত প্রদান করেছেন। সহমরণ প্রথা বহুদিন যাবভ প্রচলিত থাকলেও বিভিন্ন সময়ে অনেকেই এর সমালোচনা করেছেন। বানভট্টও তাঁর লেখা 'কাদম্বরী' গ্রন্থেও এই প্রথার তীব্র নিন্দা করেছেন। সমস্ত দিক বিবেচনা করে প্রিভি কাউন্সিল ১৮৩২ সালে রাজা রামমোহন রায়ের স্বপক্ষে রায় দিয়ে সতীদাহ প্রথাকে ভারতবর্ষ থেকে চিরতরে বন্ধ করলেন।

সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার সাথে সাথে যে প্রশ্ন শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত বঙ্গসমাজের বুদ্ধিজীবী মহলকে চিন্তাগ্রস্ত করেছিল তা হল বিধবা বিবাহ প্রবর্তন এবং বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা রোধ করা। সেই কাজে প্রথম অগ্রসর হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অল্পবয়সী বিধবাদের সকরুণ মুখচ্ছবি দেখে তাঁর অন্তর দুঃখে বিগলিত হয়েছিল। শুধু বিদ্যাসাগর নন, তাঁর মাতা ভগবতী দেবীও সমদুঃখে ব্যথিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই ঈশ্বরচন্দ্রকে বলতেন 'বালিকা বিধবাদের সকরুন মুখগুলি দেখে আমি চোখের জল সংবরণ করতে পারি না। তুমি এদের দুর্গতির প্রতিবিধান করলে আমি খুব খুশি হব। মায়ের আদেশ ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে ছিল দেবতার আদেশস্বরুপ, যদিও মূর্তিপূজায় তাঁর কোনদিন বিশ্বাস ছিল না।

১৮৩২ সালে রাজা রামমোহন রায়ের একক প্রচেষ্টায় সতীদাহ প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়ার পরে সমাজ সংস্কারকেরা বিধবা বিবাহের প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। অবশ্য তার পূর্বে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ তাঁর নিজের কন্যার বিধবা বিবাহের প্রবর্তনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে মতিলাল শীল, হলধর মল্লিক প্রমুখ কলকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিধবা বিবাহ প্রচলনের উদ্দেশ্যে একটি সভা আহ্বান করার কথা চিন্তা করেছিলেন। সেই আলোচনায় ডিরোজিওর ছাত্র-শিষ্যরা বা ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী খুবই উৎসাহী ছিল। ১৮৪২ সালে ইয়ংবেঙ্গলের মুখপাত্র হিসেবে 'বেঙ্গল স্পেক্টার' নামে পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করার পরে তার প্রথম সংখ্যায় 'বিধবার পুনর্বিবাহ' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি প্রকাশের পরে বঙ্গসমাজে কিছু বিতর্ক দেখা দেয়। ১৮৫৩ সালের প্রথম দিকে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের বিষয়ে কলকাতায় তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে তৃতীয় সভাটিতে সভাস্থলে এত সংখ্যক লোকের আগমন হয়েছিল যে বসার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়নি। শুধুমাত্র বাক্যব্যায় না করে বাঙালি যুবকদের দুএকজন বিধবা বিবাহ করতে এগিয়েও এসেছিলেন।

এই সমস্ত আলোচনা ও সভা সমিতির পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক যুগ নির্দেশিত পথে এগিয়ে এলেন সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং পরবর্তী সময়ের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের কোন এক আত্মীয়া বালিকা বয়সে বিধবা হওয়াতে তার কষ্ট দেখে বিদ্যাসাগরের মা ভগবতী দেবী খুব দুঃখ করে বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন 'তোদের পোড়াশাস্ত্রে কি কচি মেয়েদের পুনর্বিবাহের কোন বিধি নাই ? জননীর এই কথাগুলি শুনে বিদ্যাসাগরের দয়ালু হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হয়েছিল। মায়ের আদেশ শুনে বিদ্যাসাগর এই প্রথা বন্ধ করার অভিপ্রায়ে সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে সমস্ত পুঁথি তন্নতন্ন করে পড়ে এ বিষয়ে শাস্ত্রের বচন উদ্ধার করে মাকে জানিয়েছিলেন 'মা শাস্ত্রের বচন পাইয়াছি, এখন বিধবার বিবাহ দিতে হইবে - তুমি কি বলো ? পুত্রবৎসল মাতা পুত্রকে উৎসাহ দিয়া কর্মে প্রবৃত্ত করালেন।

বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার উল্লেখ করে লিখেছিলেন "১২৬০ বঙ্গাব্দের (১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) শেষভাগে একদিন রাত্রিকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আমি একত্রে বাসায় ছিলাম। আমি পড়িতে ছিলাম, তিনি একখানি পুঁথির পাতা উল্টাইতে ছিলেন। এই পুঁথিখানির নাম 'পরাশর সংহিতা'। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হঠাৎ তিনি আনন্দ বেগে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন 'পাইয়াছি পাইয়াছি'। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'কি পাইয়াছেন ?' তিনি তখন পরাশর সংহিতার সেই শ্লোকটি আওড়াইলেন - "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যো বিধিয়তে"।।

১৮৫৫ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হলো তাঁর লিখিত প্রবন্ধ 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এত চিষয়ক প্রস্তাব'। সেখানে তিনি শাস্ত্রের প্রবচন উদ্বৃত করে বললেন বিধবা বিবাহ প্রচলিত না হওয়ায় সমাজে নানারূপ অনৈতিক আচরণ, ব্যভিচার, ভ্রুনহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেজন্য পক্ষপাতশূন্য হয়ে সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তিদের এই বিষয়ে সার্থক চিন্তার অবিলম্বে প্রয়োজন। বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রসন্মত সে কথাও তিনি প্রমাণসহ ব্যাখ্যা দিলেন। বইটি লিখিত আকারে প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি সমাজে প্রচন্ড আলোড়নের সৃষ্টি হলো। বইটি প্রকাশের এক সপ্তাহের মধ্যে দু হাজার কপি শেষ হয়ে যাবার পরে তিন হাজার কপি ছাপা হলেও নিঃশেষিত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ১০০০০ কপি ছাপা হয়। বইটি প্রকাশের পরে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ত্রিশটি প্রতিবাদ পুস্তিকাও প্রচারিত হয়। প্রতিবাদ পুস্তিকাগুলির বেশিরভাগই গালিগালাজে পূর্ণ এবং অন্যগুলিতে বিধবা বিবাহের বিপক্ষে শাস্ত্রীয় বিচারের ধারা অনুসৃত। সেখানে বলা হয়েছিল বিধবা বিবাহ অশাস্ত্রীয়,বিধবা বিবাহ এদেশের প্রথা ও আচারবিরুদ্ধ এবং বিধবা হওয়া পূর্ব জন্মের পাপ প্রভৃতি। চারিদিকে নিন্দার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। সেকালের স্বনামধন্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবা বিবাহের বিপক্ষে ছিলেন। তিনি তাঁর পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা লিখে এই প্রস্তাবকে ব্যঙ্গ করলেন।

"বাঁধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়ো আদি করি মাতিয়াছে সব।।
কেহ উঠে শাখা পরে কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমাণ যত পাঁজিপুঁথি খুলে।।
এক দলে যত বুড়ো আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাপে সব দেখে নাক গোড়া।।"

শেষ পর্যন্ত এই বাদ-প্রতিবাদের ঝড় পন্ডিতদের মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকেনি। সাধারণ মানুষেরাও হইচই শুরু করে ছিলেন। নদীয়ার শান্তিপুরের তাঁতীরা এক রকমের শাড়ি বুনে তার নাম দিলেন 'বিদ্যাসাগর পেড়ে শাড়ী'। শাড়ির পাড়ে বিদ্যাসাগরের প্রশস্তি গেয়ে একটি ছড়া লেখা থাকতো। তার প্রথম দু লাইন বলছি "সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে/ সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে"।

১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর বিদ্যাসাগর বিধবা

বিবাহের স্বপক্ষে ৯৮০ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য পাঠান। আবেদন পত্রটিতে এই নীতিবিরুদ্ধ, নিষ্ঠুর দেশাচারকে অশাস্ত্রীয়, সামাজিক অকল্যাণের কারণ বলা হয়েছিল। আবেদনকারীদের মতে বিধবা বিবাহ বিবেকবিরুদ্ধ নয়। তাই তাঁরা ব্যবস্থাপক সভার কাছে বিধবা বিবাহের বৈধতা স্বীকার করে আইন প্রণয়ন ও প্রচারের অনুরোধ করলেন যাতে হিন্দু বিধবাদের বিবাহের সর্বপ্রকার বাধা দূর হয় এবং বিবাহজাত সন্তানেরা সমাজে বৈধ সন্তান বলিয়া গৃহীত হয়। আবেদনপত্রে প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন হুগলি উত্তর পাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং সর্বশেষ স্বাক্ষরকারী হলেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজের বিভিন্ন স্তরের দিকপাল ব্যক্তিরা যেমন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, রাজীব লোচন শর্মা, হরচন্দ্র দত্ত ও রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের আবেদনপত্র প্রেরিত হবার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রস্তাবিত বিধবা বিবাহ আইনের সমর্থনে অসংখ্য আবেদনপত্র সরকারের কাছে যেয়ে পৌঁছতে লাগল। অবশ্য প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করেও বহু সংখ্যক পত্র যেয়ে পৌঁছাতে লাগল। সমস্ত দিক বিবেচনা করে ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহের অনুকূলে আইন পাস করলেন।

কিন্তু আইন পাস হলেই তো আর চলবে না তার বাস্তব প্রয়োগ না হলে এর কোন অর্থই থাকবে না। এক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর এগিয়ে এলেন। এই বৎসরের ৭ই ডিসেম্বর, বাংলা ২৭শে অগ্রহায়ণ বিদ্যাসাগরের অন্যতম বন্ধু সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তান শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সর্বপ্রথম আইনসম্মত ভাবে দ্বাদশ বৎসর বয়স্কা বিধবা কালীমতি দেবীকে বিবাহ করেন। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তখনকার দিনে দশ হাজার টাকা খরচ করে বিদ্যাসাগর এই বিবাহ দেন। যেদিন এইরূপ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেদিন শহরে এরূপ জনরব উঠেছিল যে বিরুদ্ধ পক্ষের লোকেরা বিদ্যাসাগরকে মেরে ফেলবে, যার জন্য প্রতি ১০ থেকে ১৫ হাত অন্তর পুলিশ প্রহরী মোতায়েন ছিল। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁরা প্রথমে বিদ্যাসাগরের পক্ষে মত দিয়েছিলেন ও বিবাহ স্থলে উপস্থিত ছিলেন পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই বিদ্যাসাগরকে পরিত্যাগ করেন। এমনকি বিদ্যাসাগরের নিজের পিতাও বাড়ি ছেড়ে কাশীবাদী হয়ে যান। কিন্তু তাঁর মা তাঁকে ছেড়ে কোনদিন চলে যান নি। যে সকল বিধবা বালিকা পুনর্বিবাহিতা হয়ে আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা পরিত্যাক্তা হয়েছিল ভগবতী দেবী সাদরে তাদের নিজকন্যার ন্যায় ভালোবাসিতেন এবং মাতৃস্নেহে অভিষিক্ত করতেন।

শ্রীশচন্দ্রের বিধবা বিবাহের পরে চারিদিকে গুঞ্জন উঠেছিল বিদ্যাসাগর অপরের বিধবা কন্যার বিয়ে দিয়ে পরের ছেলের জাত খুইয়ে, 'পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে' সুনাম নিচ্ছেন। এই অপবাদ দূর করার জন্য ১২৭৭ বঙ্গাব্দের ২৭শে শ্রাবণ নিজের পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের সাথে খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এগারো বৎসর বয়স্কা কন্যা ভবসুন্দরীর বিয়ে দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে একপত্র মারফৎ জানিয়েছিলেন " আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি। নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যকবোধ হইবেক, তাহা করিব। লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না"।

বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ চালু করার পরে তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন হয়েছিল। এই জন্য পাইকপাড়ার রাজপরিবার তাঁর নিরাপত্তার জন্য সবসময় চারজন পাইক নিয়োগ করেছিলেন।

বিধবা বিবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে আরো দুটি জ্বলন্ত সমস্যা সমাজে প্রচলিত ছিল। প্রথমটি হল বাল্যবিবাহ এবং দ্বিতীয়টি বহুবিবাহ প্রথা। বাল্যবিবাহ রোধ এবং বহুবিবাহ প্রথা নিষিদ্ধ হলে বাল্য বিধবাদের সমস্যা অনেকাংশ যে দুর হবে সে কথা বিদ্যাসাগর জানতেন। কিন্তু তবুও তিনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য এতখানি উঠে

পড়ে লেগেছিলেন কেন? কারণ বিদ্যাসাগর ছিলেন 'করুণার সাগর'। চোখের সামনে বাঙালি সমাজে বাল্যবিধবাদের দূরবস্থা তাঁকে বিচলিত করেছিল। সেই কারণে বিধবা বিবাহের জন্য তাঁকে আর্থিক দিক দিয়ে সর্বশান্ত হতে হয়েছিল, এমনকি প্রাণ সংশয়েও তিনি চিন্তান্বিত হননি। বিধবা বিবাহ দিতে বিদ্যাসাগরের সেই সময়ে ৮২ হাজার টাকা ঋণ হয়েছিল। ঋণ পরিশোধের জন্য পাইকপাড়া রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ তাঁকে এক লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নিজের প্রবল আত্মসম্মানের জন্য বিদ্যাসাগর সেই টাকা নিতে অস্বীকার করেছিলেন।

বিধবাবিবাহ আইন দীর্ঘদিনের সংস্কারের মুলোচ্ছেদ করতে পারেনি। আদর্শগত কারণে ক'জন বিধবা বিবাহ করেছিলেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। দু' চারজন ছাড়া অধিকাংশই বিয়ে করেছিলেন টাকার লোভে ও নারীসঙ্গের প্রলোভনে। জীবনসায়াহ্নে এসে এ ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। অনেকে অর্থলোভে তাঁকে প্রবঞ্চনা করে বিধবাবিবাহের সুযোগ নিয়ে বহুবিবাহ করত। এই প্রকার লোকের দুষ্টুবুদ্ধি বন্ধ করার জন্য শেষ পর্যন্ত বিধবা বিবাহকারীকে দিয়ে তিনি একটি অঙ্গীকার পত্র লিখিয়ে নিতেন। অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা পেয়ে 'করুণার সাগর' বিদ্যাসাগর এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে মনে হয়। বিধবা বিবাহস্থলে উপস্থিত থাকার জন্য অনেকে অনুতপ্ত হয়ে বাড়ি ফেরার পথে গঙ্গাস্নান করে, হরিধ্বনি দিয়ে, গোময় খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতেন। এমনকি প্রথম বিধবা বিবাহকারী বিদ্যাসাগরের বন্ধু শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর পত্নী কালীমতী দেবীর মৃত্যুর পরে পন্ডিতদের বিধানে প্রায়শ্চিত্ত করে নিজের জাতে উঠেছিলেন।

এইসব দেখে শুনে জীবনসায়াহ্নে এনে বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করলেন প্রকৃত শিক্ষার অভাবে, বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ না হলে এবং লোকের মনে সামাজিক দায়িত্ববোধ না জাগরিত হলে শুধু আইনের জোরে বিধবা বিবাহ চালু হলেও তা সফলতা লাভ করেনি।

স্ত্রী শিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন এবং বাল্যবিবাহ রোধের জন্য তাঁর অক্লান্ত সংগ্রাম বিদ্যাসাগরকে উত্তরকালের বিবেচনায় অনন্য 'যুগস্রষ্টা'র মর্যাদা দান করেছে। শাস্ত্রে নারীকে পূজা করার বিধান থাকলেও তখনকারের পন্ডিতেরা "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রম অর্জতি" বলতেও দ্বিধা করতেন না। শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং আত্মপ্রকাশের সবরকম সুযোগ বঞ্চিত মহিলারা নিতান্ত অবহেলা ও অনাদরে অবাঞ্ছিত আগাছার মত সংসারে বেড়ে উঠতেন। বিদ্যাসাগর এরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তর্ক ও যুক্তিজাল বিস্তার করে কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এই মনোভাবকে তাঁর 'সুমহৎ পৌরুষের একটা লক্ষণ' ভাবতেন। চরিত্রপূজা গ্রন্থে এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন "অবশেষে তিনি যখন বাল্য বিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেন তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক ও বাংলা গালিমিশ্রিত এক তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালিবর্ষণের মধ্যে এই ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন। বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন - তিনি প্রতিদিন দেখিয়েছেন আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না, আরম্ভ করি কাজ করি না, যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না, ভুরিপরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি কিন্তু তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারিনা। আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না। আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি। পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধুলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স এবং নিজের বাকচাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক

সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ তিনি সর্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।

বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ রোধ এবং বাল্যবিধবাদের পুনর্বিবাহ ছাড়াও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে এবং বাংলা পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আজকে আমরা বাল্যবয়সে লেখাপড়া শুরু করি যে পুস্তকের সাহায্যে সেই বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণ কৌমুদী বিদ্যাসাগররে লেখা। এছাড়াও বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে তিনি অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় ৩৫ - ৩৬ টি স্কুল স্থাপন করেছিলেন যেখানে স্ত্রী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সমাজের প্রতি বিদ্যাসাগরের এই দায়বদ্ধতা বাঙালি সমাজ কোনদিনই ভুলবে না।

দেশের ও সমাজের প্রতি এতখানি কাজ করার পরেও শেষ বয়সে কিন্তু বিদ্যাসাগরকে তাঁর নিজের বাসভূমি এবং কলকাতা পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছিল সুদূর বিহারের কার্মাটাড়ে, যেখানে তিনি গরীব আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়েছিলেন দীর্ঘদিন যাবৎ।

তারাপীঠে নববর্ষ উদযাপন

প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

১১০৭ বঙ্গাব্দে আশ্বিনের শুক্লা চতুর্দশীতে মায়ের আবির্ভাবের উৎসবের পর মন্দিরে নববর্ষ উদযাপন ও তারামায়ের কাছে বিশেষ পুজোপার্বণাদি সাধক ১ম আনন্দ নাথ ও কিশোর পাণ্ডা চালু করেন এবং এইদিন তৎকালীন জমিদার, সেরাস্তাদার, তাদের অধীনস্থ কর্মী, ব্যবসায়ীবৃন্দ, গ্রামবাসী ও সেবাইতবৃন্দ অতি প্রত্যুষেই স্নান করে ও নববস্ত্র পরিধান করে মায়ের কাছে পুজো দিতে আসতেন। সেই পুজো দেওয়ার ধারাবাহিকতা আজও সমানে মন্দিরে হয়ে আসছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জীব জগৎ সৃষ্টির পর সেই আদি অনাদিকাল হতে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়ার চিরাচরিত গতি আজও চলে আসছে। ভূপ্রকৃতি, আকাশের গ্রহ তারকার অবস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও নদ নদীর বিশেষ করে নীল নদের বন্যার সময়ের সাথে সাযুজ্য রেখে মিশরীয়রা পৃথিবীতে প্রথম পঞ্জিকা সৃষ্টি করেন।তারপর বিভিন্ন দেশ ও ভাষাভাষীর মানুষ পৃথিবীর সূর্য প্রদক্ষিণের আহ্নিক ও বার্ষিক গতির উপর ভিত্তি করে ক্যালেন্ডারের সৃষ্টি করেন। এইভাবেই ইংরেজী, হিজরি, শকাব্দের সাথে বাংলা নববর্ষের সূচনা হয়। প্রথম বাংলা নববর্ষের সূচনা মহামতি সম্রাট আকবর করেন। প্রথমে বঙ্গাব্দের সূচনা কারী মাস ছিল অগ্রহায়ণ, পরবর্ত্তীতে হয় বৈশাখ মাসে। বিশাখা নক্ষত্র যুক্ত পূর্ণিমাকে বৈশাখী পূর্ণিমা এবং মাসকে বৈশাখ মাস বলে। বাঙালীদের কাছে ১লা বৈশাখ দিয়ে নববর্ষের সূচনা এবং ৩১শে চৈত্রের মধ্যে সমস্ত বছরের অবসান।

১লা বৈশাখ নববর্ষের সূচনাকারী দিন হিসেবে চিহ্নিত হলেও অন্য পাঁচটি দিনের মত নিছক একটি দিন ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু এই দিনটিই আবার জীবনের উত্তরণের দিন। এই দিন মানুষ জীবনের জড়তা, দৈন্য, মালিন্য, হতাশা সব কিছু জলাঞ্জলী দিয়ে নতুন আশা ও উদ্যমে উত্তরণের ব্রত গ্রহণ করে সঞ্জীবনী সুধা রূপে জীবনকে চালনার মন্ত্র গ্রহণ করে। প্রতিটি ভক্ত মায়ের

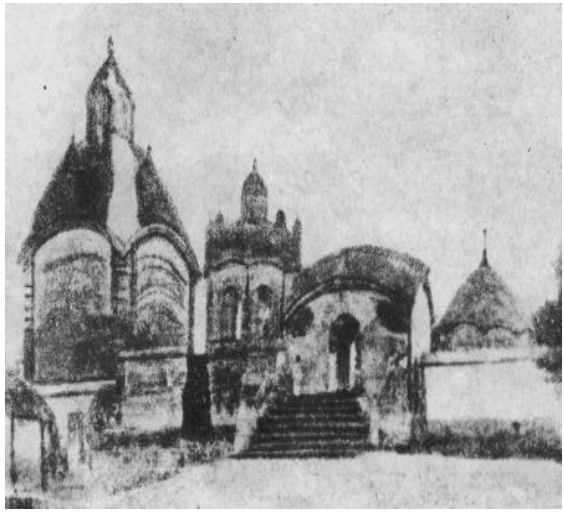

কাছে আকুতি নিয়ে সারা বছর যেন সুখে শান্তিতে নির্বিবাদে ঘর সংসার করতে পারে সে জন্য প্রার্থনা জানায়। বহু মানুষ বিবেক, বৈরাগ্য ও মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্যও আবাহন করেন। ব্যবসায়ীরা পায় ব্যবসায়ে আর্থিক সাফল্য লাভের আশা, মেতে উঠে গণেশ বন্দনায়। গণেশই তো সিদ্ধিদাতা বাধা বিঘ্ন নাশের প্রতীক। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মন্দিরে ও প্রার্থনালয়ে চলে হালখাতা পূজা ও বিশেষ সাফল্য লাভের প্রার্থনা। দোকানে দোকানে ক্রেতাদের দেওয়া হয় মিষ্টির প্যাকেটসহ নতুন নতুন ক্যালেন্ডার। ব্যাবসাদার ও বিভিন্ন বৃত্তির মানুষ এই দিনটিতেই শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করে। মোবাইলেও চলে শুভেচ্ছা বিনিময়।

বাংলা নববর্ষের ১ম দিন হিসেবে তারামায়ের কাছে স্থানীয় মানুষ বিশেষ করে ছোট বড় ব্যবসায়ীরা পূজা দিতে মন্দিরে আসেন। এই দিনটি মায়ের আবির্ভাবের উৎসবের (১৭০১) পর হতে প্রতিটি তারামায়ের ভক্তবৃন্দ, সেবাইত ও ব্যবসায়ীগণ পূজো দিয়ে আসছেন এবং তার ধারাবাহিকতা বছর বছর উদযাপিত হচ্ছে। একসময় রামপুরহাট হতে প্রতিটি ব্যবসায়ী ১লা বৈশাখ তারাপীঠে পূজো দিতে আসতেন। বর্তমানে ভিড়ের কারণে বাড়িতে

কিংবা নিকটস্থ মন্দিরে যান। এই দিন তারামায়ের কাছে হালখাতা উৎসর্গ করে প্রার্থনা জানাই যা'তে সারা বছর ব্যবসায়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। ব্যবসায়ীবৃন্দ ছাড়াও সরকারী কর্মী, শিক্ষক ও বিভিন্ন পেশার মানুষ নববর্ষের ১ম দিন ৺তারামায়ের চরণ স্পর্শ করতে ও মা'কে অঞ্জলি দিতে আসে। হালখাতা পূজা, ক্যালেন্ডার ও মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণের মধ্যে বৎসরের ১ম দিনের উৎসব বেশ আনন্দের মধ্যেই উদযাপিত হয়। প্রতিটি ভক্ত মায়ের কাছে আকুতি নিয়ে সারা বছর যেন সুখে শান্তিতে নির্বিবাদে ঘর সংসার করতে পারে সে জন্য প্রার্থনা জানায়। বহু মানুষ বিবেক, বৈরাগ্য ও মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্যও আবাহন করেন। বৈশাখ মাসে প্রতিদিন বৈকালিক ভোগ নিবেদন হয়। ছোলার ডাল কিংবা মুগ ভিজা, শসা, লিচু, বেল, আম, তরমুজ, আপেল, কলা, বাতাসা, সন্দেশ, প্যাঁড়া, পেনখাজুর, চেরিফল, নারিকেল ইত্যাদি বিভিন্ন মরসুমি ফল ও মিষ্টান্ন দিয়ে বিকালে শীতল নিবেদন করে উপস্থিত সমস্ত মায়ের ভক্তদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। বৈকালিক শীতল নিবেদনের পদ্ধতিটি কেবলমাত্র বৈশাখ

মাসেই হয় যা মায়ের পূজা পদ্ধতির প্রথম থেকেই অদ্যাবধি চলে আসছে। তারাপীঠের প্রত্যেকটি অধিবাসী বিশেষ করে ব্যবসায়ীরা এই দিন তারামন্দিরে ভিড় করে এবং হালখাতায় স্বস্তিকা চিহ্ন ও তারা লিপিবদ্ধ করে নববর্ষের সূচনার মধ্যে তারামাকে আবাহন ও পূজো সম্পাদন করে সারা বছরের আর্থিক সাফল্যের প্রার্থনা নিবেদন করেন।

শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা

দাস সাপ্লায়ার্স

গভঃ কন্টাক্টর

প্রোঃ রঞ্জন কুমার দাস

এখানে সমস্ত প্রকার নির্মাণ কাঠের মালপত্র অর্ডার সাপ্লায়ার্স এর ব্যবস্থা আছে।

চাবাই ❖ নারমা পশ্চিম মেদিনীপুর

“রানী শিরোমনির জন্ম স্থান বিতর্ক”

তপন কুমার সিংহ

কর্ন গড় রাজ বংশের সর্ব শেষ রাজা ছিলেন ইতিহাস খ্যাত রাজা যশবন্ত সিংহের পুত্র রাজা অজিৎ সিংহ। তাঁর ছোট রানী- রানী শিরোমণি ছিলেন ঐ রাজ পরিবারের সর্বশেষ প্রতিনিধি তথা শেষ রানী। কিন্তু তাঁর জন্ম স্থান কোথায়, বা তিনি কোন বংশে জন্মেছিলেন, সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য কোথাও তুলে ধরা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। এমন কি“মেদিনীপুরের ইতিহাস” রচয়িতা শ্রদ্ধেয় যোগেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ও তাঁর জন্ম স্থান সম্পর্কে কোন তথ্য দিয়ে যাননি। এমত অবস্থায় বর্তমান প্রতিবেদক কিছু তথ্য পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরলেন, যেখান থেকে কিছু টা হলেও ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

বেশ কয়েক বছর আগে শ্রদ্ধেয় বিপ্লব মাজী তাঁর “নিম্ন বর্গের ইতিহাস - রানী শিরোমণি ও চুয়াড় বিদ্রোহ” নামক পুস্তকে বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন, কিন্তু সেখানেও আবার পরস্পর বিরোধী তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই পুস্তক সঙ্কলনে বেশির ভাগ লেখক ই রানী শিরোমণি কে মূলত অনগ্রসর জনজাতি গোষ্ঠী ভুক্ত বলে অভিহিত করেছেন। এখানে একমাত্র তপন চক্রবর্তী মহাশয় রানী শিরোমণি কে সরকার বংশ, অর্থাৎ সদ্ গোপ কন্যা বলে চিহ্নিত করেছেন। আর জন্ম স্থান হিসাবে সেরকম কোন নির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ নেই। বেশিরভাগ লেখক উল্লেখ করেছেন; তিনি জন্মেছিলেন, কেল্লা অদূরবর্তী কোন গ্রামে।

গোপ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা, বিশিষ্ট লেখক-গবেষক, শ্রদ্ধেয়া অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায় তার গবেষণা মূলক গ্রন্থেও রানী শিরোমণি কে অনগ্রসর জনজাতি গোষ্ঠীর কন্যা বলে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য এই লেখকের সঙ্গে আলাপের পর তিনি তার মত পরিবর্তন করেছেন। তিনি এক প্রকার স্বীকার করে নিয়েছেন যে, রানী শিরোমণি তথা কথিত নীচ বংশজাত ছিলেন না।

বিশিষ্ট আঞ্চলিক ইতিহাস লেখক এবং গবেষক মাননীয় মানিক চন্দ্র মাহাত মহাশয় বর্তমানে শালবনি ব্লকের পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাসের ওপর গবেষণা মূলক কাজ করছেন। তিনিও তার লেখায় রানী শিরোমণির জন্ম স্থান হিসাবে কেশপুর থানার অন্তর্গত আনন্দ পুর গ্রামের কথাই উল্লেখ করেছেন। এই গ্রামের সরকার বংশেই যে তিনি জন্মেছিলেন তার সমর্থনে একটি বংশ তালিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

অতি সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় মধুপ বাবু, মধুপ দে মহাশয় তার- “রাজদ্রোহী রানী শিরোমণি” তথ্য মূলক বইটি প্রকাশ করেছেন। সেখানে তিনিও জন্মস্থান হিসাবে আনন্দপুরের সরকার বংশের কথাই উল্লেখ করে গেছেন।

পরিশেষে একথা বলা মনে হয় খুব একটা অন্যায় হবে না যে, রাণী শিরোমণির জন্ম আনন্দপুর সরকার বংশেই। যাইহোক এ ব্যাপারে আরো অনেক গবেষণা এবং তথ্য প্রমাণের প্রয়োজন আছে বলেই মনে হয় এবং সেই কাজে তরুণ গবেষক দের আরো অনেক আগ্রহ দেখানোর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

মোগলমারির বৌদ্ধবিহার

নির্মল ঘোড়াই

চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ বর্নিত পশ্চিম মেদিনীপুরে দাঁতনের মোগলমারির বৌদ্ধবিহার এখন পর্যটন মানচিত্রে প্রথম সারিতে। সপ্তম শতকে ভ্রমন কালে হিউয়েন সাঙ তাম্রলিপ্ত এলাকায় দশটি বৌদ্ধবিহারের উল্লেখ করেছিলেন। মোগলমারি যেহেতু তাম্রলিপ্তের কাছাকাছি সেহেতু এই বৌদ্ধবিহারকে দশটির মধ্যে একটি হিসাবে ধরা হয়। প্রতিনিয়ত চলছে অনুসন্ধান ও খননকার্য। নিত্য নূতন প্রত্নতত্ব সামগ্রীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। মোগলমারি শুধুমাত্র বৌদ্ধবিহার নয়, এখান থেকে পাওয়া গেছে প্রাচীন এক জনপদের নানান পরিচয়। বিশেষজ্ঞদের ধারনা সপ্তম শতকে নির্মিত হয়েছিল মোগলমারির বৌদ্ধবিহার।

১৯৯৯ সালে মোগলমারি প্রথম নজরে আসে। যে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্বিক বিভাগের অধ্যাপক অশোক দত্ত সুবর্ণরেখা নদী সংক্রান্ত গবেষনাকালে এলাকা পরিদর্শনে আসেন, সে সময় দাঁতন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নরেন বিশ্বাস তাঁকে মোগলমারি বিষয়ে অবহিত করেন। ২০০৩ সালে প্রত্নতত্ব বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অশোক দত্তের তত্বাবধানে মোগলমারিতে প্রথম খননকার্য শুরু হয়। সাতবার খনন করার পর প্রত্নতত্ববিদগন হিউয়েন সাঙ বর্নিত দশটি মহাবিহারের মধ্যে এর মিল খুঁজে পেয়েছেন। তাদের অনুমান এত বড় বিহার খুব কমই আছে।

মূল বৌদ্ধমন্দিরটির দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৬০ মিটার। যদিও সমসাময়িক নালন্দার মূল মন্দিরের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ৭০ মিটার। মোগলমারির প্রত্নস্থলের মূল বৈশিষ্ট্য হল দেওয়ালের অলংকরন বৈচিত্র্য। অলংকরনগুলি স্ট্যাকো বা চুন বালির মন্ড দিয়ে তৈরি। খনন করে বুদ্ধমূর্তি, প্রায় ৪০ রকমের বিভিন্ন সময়ের ইঁটের সারি, ধ্বংসাবষের মধ্যে ৪২০ সেমি গভীরে বিভিন্ন ধরনের স্তুপ পাওয়া যায়। এই স্তুপগুলির মধ্য দিয়ে সেই সময়ে বৌদ্ধবিহারে যে সব রাজা ও শ্রেষ্ঠীরা অর্থ সাহায্য করতেন তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। খননক্ষেত্রে পোড়াহাঁড়ির ভিতরে ২০০টির বেশী কড়ি পাওয়া গেছে। এই কড়িগুলির মধ্য দিয়ে তখনকারদিনে যে সুবর্নরেখা নদী ও বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়ে তাম্রলিপ্ত বন্দরের সাথে ব্যবসা বানিজ্য হত তার পরিচয় মেলে।

প্রত্নক্ষেত্রটির অধিকাংশ এখনও মাটির তলায়। ২০১৩ সালে খনন করে 'শ্রীবন্দক মহাবিহার' ফলক, স্ট্যাকো মূর্তি, প্রবেশদ্বার, বৌদ্ধভিক্ষুকদের থাকার জায়গা, বেশকিছু উৎসর্গ পাত্র, গুপ্ত উত্তর যুগের মিশ্র ধাতুর বহু পুরাতাত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়। আরও খনন হলে এই বৌদ্ধবিহারের সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যাবে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন নবম ও দশম শতকে পাল আমলে এই বৌদ্ধবিহার ধর্ম ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রস্থল হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। ২০০৮ সালে পুরাতত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ মোগলমারিকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মোগলমারির বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। দেশ বিদেশের ছাত্র, শিক্ষক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, গবেষক ও পর্যটকদের কাছে এই মহাবিহার আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। এই বৌদ্ধবিহার ও প্রত্নক্ষেত্রটি বিজ্ঞানসম্মত ও সুপরিকল্পিত ভাবে উন্মোচন ও সংরক্ষন হলে এই মহাবিহার বিশ্বের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

With best compliments from -

Mob. - 95648250917
9732884166

MONI PAINTS
AND MONI BUILDERS

DASPUR :: PASCHIM MEDINIPUR

১৯৪২ - একটি মৃত্যুদৃশ্য
(কখনও শেষ না হওয়া একটি পরিপূর্ণ স্বপ্ন)

আরণ্যক বসু

বিপন্নতার শেষ আভাটুকু মুছে দাও দীপান্বিতা; নকল আলো বড্ড বেমানান এ ঘরে।
প্রদীপ জ্বেলে দাও। জানালাগুলো একটু খুলে দাও। বাল্মীকি তোমার নতুন
কবিতা শেষ করো।
একটু পরেই ভোর হবে। রত্নাকর, তেমাথায় বটগাছের নিচে পাহারায় থাকো,
ব্রিটিশ পুলিশ যেন টের না পায়। - এই মুহূর্তটুকু বড় পবিত্র।
তিনি চলে যাচ্ছেন, যেখানে সবাইকে ফিরে যেতে হয়।
ভালোবাসার দশদিগন্ত একদিন উদ্ভাসিত হবে মানুষ ও প্রকৃতির ছন্দবন্ধনে-এই
আশা নিয়ে কড়িকাঠে শূন্য দৃষ্টি মেলে অপেক্ষা করছেন মহান মৃত্যুর।
কারো চোখে চোখ না ফেলে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের কবিতা
খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলে বোঝা যায়-ঝড়ের খেয়া।
ধীরে ধীরে তাও থেমে গেল। ওষুধের শিশি তুলে নাও অলকানন্দা, যেন ঘুম না
ভাঙে। অভিমন্যুকে সরিয়ে নাও উত্তরা, ও কান্না চাপতে পারছেনা।
চিত্রাঙ্গদা শেষ কাজের পরে ফিরে যেন মণিপুরে, সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা
করছে হাজার নারীর সমবেত জেগে ওঠা।

জানি একদিন উড়বেই স্বাধীনতার পতাকা।
আমাদের কাজ কিন্তু শেষ হবে না, আবার নতুন করে শুরু হবে।
হয়তো কারো সঙ্গে দেখা হবে না আর;
দেখা হবে না মৈমনসিংগীতিকার সঙ্গে হ্যাজাক জ্বলা টুসুভাসু আসরের।
দেখা হবে না মুশিদী, গম্ভীরার সঙ্গে মনসা ভাসানের।
দেখা হবে না সোজনবাদিয়ার ঘাটে নক্সিকাঁথায় আঁকা মন পবনের নাও।

তবু, আমরা সবাই থাকবো নতুন ও স্বপ্নের পৃথিবী দেখবার জন্যে।
বছরের এই দিনটিতে তাঁকে মনে করে ভাসাবো প্রদীপ ও কাগজের নৌকো।

জলঙ্গী, চুর্ণি, ইছামতী-ভুলে যেও না ঢেউয়ে দোলা ছোট্ট ডিঙিদের,
তারা ভালোবেসেছিল তোমাদের। সত্যিকারের ভালোবেসেছিল।
তিনি চেয়েছিলেন আবার মানুষ হয়ে জন্মাতে; প্রবল যুক্তিবাদী-
তবু, পরজন্মে বিশ্বাস রেখে চলে যাচ্ছেন।
পরীক্ষিৎ, সুশোভনা, ওকে চন্দন পরিয়ে দাও,
প্রস্তুত করো বিপ্লবীর শেষ শয্যা।
সরস্বতী, কুন্তী, গঙ্গা, তোমাদের ত্রিবেণী সঙ্গমে সারা হোক শেষ অগ্নিস্নান।

বীরবাহু সংযত হও, এ বিষণ্ণতা মানায় না তোমাকে, মেঘনাদ ওকে বোঝাও।
ইন্দ্র, অহল্যা, গৌতম শপথ নাও প্রতারণা আর ওপরচালাকিহীন পৃথিবী গড়বার।

পুলিশের তীব্র হুইসেল-এ সকাল ছিন্নভিন্ন হবার আগেই এসো আমরা মুছে ফেলি
আপাত অবস্থানের যাবতীয় বিস্মৃতি চিহ্ন।
জঙ্গলে ঢেকে যাক এই পোড়ো আস্তানা, যাতে ভবিষ্যতে কেউ এখানে
পিকনিক করতে না আসে।
তানসেন, খুব মৃদু কণ্ঠে রজনীকান্তর গান শোনাও-লক্ষ্য শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে...
এসো, এই ফিসফিস বৃষ্টিপতনের শব্দকে সাক্ষী রেখে
উচ্চারণ করি-বন্দেমাতরম
চলো, এগিয়ে যাই।

সাধারণ বীমা সাধারণ বীমা সাধারণ বীমা

সাধারণ বীমার সম্বন্ধে জানতে হলে পড়ুন —

শংকর কুমার মাইতি লিখিত

সাধারণ বীমা

৬ষ্ঠ সংস্করণ

Hand Book Of General Insurance

For Agents & Bancassura - NCE

11th Edition

Available From Amazon

বাসন্তী হাওয়া

শ্যামল চন্দ্র দে

ধীরে ধীরে রেশমি ওড়নার মত উড়ে গেল
আঠারোটা বসন্তের বোঝাপড়া
নির্জন নির্বাসনে বিধ্বস্ত
বিন্দু বিন্দু আলোর কোলাজ।
ফুটন্ত দুধের মত শূন্যতা
ধূসর গোধূলির প্রান্তে ভীষণ অচেনা।
চেনা চাঁদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মেঘের অন্তরঙ্গতা,
ভাঙতে ভাঙতে নদী দূরে সরে যাচ্ছে
কোনও অস্তিত্ব নেই খোলসের
টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছে গলিত বর্ণমালা
প্রদীপের শিখা নৃত্যরত আমার প্রোফাইলে।

মাতা-নির্মাতা

সৌমেন্দ্র নাথ মাহাত

মাতা নও শুধুই, স্বর সুর শব্দ ধ্বনির নির্মাতা।
জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক উন্মেষে জীব জগতের তুমিই ধাতা।।

তোমার বরে দস্যু রত্নাকর মহর্ষি বাল্মিকী
অনুভূতির লেখনীতে প্রকাশে, বিশ্বজন উঠেছে চমকি।
গণ্ডমূর্খ কালিদাস, তোমার সাধনায় হলেন মহাকবি,
তাঁর রচিত কাব্য চির অমলিন ছবি।
শিল্প কলায় সৌন্দর্যে, সঙ্গীতে ঝংকারে বীণা,
বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্বেতভূজা শ্বেত পদ্মাসনা।
চৌষট্টি কলায় সিদ্ধ কলাবতী দেবী জগন্মাতা।

মস্তিস্কে বিরাজ করো মা, আলোকিত করো সবার হৃদয়।
শুভ বুদ্ধি, শুভ চিন্তা, শুভ কর্মের!

উত্তাপ

সুনীল মাজি

লাল পাড় শাড়ি পরেছ এতদিন - দেবালয়ে যেতে হলুদ শাড়ি পরতেও দেখেছি
সবুজ শাকসবজি ফলমূল আঁকা শাড়ি পরেও নানা উৎসবে তোমাকে দেখেছি
যে রঙের শাড়িই তুমি পরো না কেন - এবার মিছিলে আমাদের যেতেই হবে।
মিছিলে না গেলে তুমি রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারবে না।
মিছিলে যাওনি বলেই আমি নজরুলের বিদ্রোহীর অনেক লাইন ভুলে গেছি।
বুকের উত্তাপ হারিয়ে গেলে কী আর থাকে বলো!
মাটির উত্তাপ হারিয়ে গেলে তোমার যতই উন্নতবীজ থাকুক
কণ্ঠে কখনোই ফুটবে না গানের সুর - উঠবে না ঝড় ধ্রুপদী কলা।
আমি চাইছি আমাদের আবার দেখা হোক মিছিলে
এই আকালের দিনে কালে ভদ্রে মঞ্চে বক্তৃতা করে কোন লাভ নেই
চলো মাটির বুকে দুজনেই পায়ে পায়ে হাঁটি
হঁলেই আমাদের মেরুদণ্ড খাড়া হবে – তখন ক্যালসিয়াম খেয়ে আর হাড় শক্ত করার দরকার পড়বে না!
যেকোনো রঙের পোশাক পরে আসতেই পারো - ভেতরের সেই লাল রক্তের প্রবাহ, আহা!
আমরা পরস্পরকে শব্দের মতো জড়িয়ে ধরব ব্রহ্ম অগ্নি!
আমরা আবার গান গাইব; আকাশ যারা নোংরা করে দানবের দল দূর হটো!

নেতা

ফেরদৌস সালাম

পৃথিবার সব রোদ তুলে নেব হাতের মুঠোয়। স্রষ্টার নিকট থেকে লিখে নেব সবকটি রাত। পাঁচ হুন্ডা দশ
গুন্ডা সারাক্ষণ থাকবে পাহারা। আইনের কালো হাত অর্থগুণে হয়ে যাবে আমার দোসর!
দুধের পাতিল থেকে ঢেলে নেব সরসহ সবটুকু দুধ
আমি নেতা, এভাবেই জয় করে নেব পৃথিবীর সুখের দলিল। গোপন পকেটে রেখে দেব মোরগের ডাক
আমার ইচ্ছেয় ভোর এসে খুলবে জানালা। আমি বললেই শোনা যাবে দোয়েলের শিস। ঘুঘুরাও
ফিরে যাবে স্বেচ্ছা নির্বাসনে। কীর্তনের পদাবলী
কেড়ে নেবে শিশিরের ঘুম।
আমার নির্দেশে জোছনালোকিত মাঠ থেকে মুহূর্তেই অন্তর্ধান হবে ধানশীষ-ঘুম যাবে পাললিক মৃত্তিকার
চোখ। কাস্তেরাও অশ্রুজলে একাকার ভাসবে প্লাবনে
না জেনেই চাষিদের অভিশাপ দেবে অনাহারী
নির্ঘুম ইঁদুর!
আমি নেতা, আমার ইচ্ছেয় লেখা হবে নারীদের
প্রসব কাহিনী। সঙ্গীতের মূর্ছনায় নিরপেক্ষ নির্বাচনে
জয়ী হয়ে সুধীজন কৃতিত্বের সকল মুনাফা
অতঃপর আমাকেই দেবে।

আমি নেতা- বড় বেশি সার্বভৌম আমি। আমি কোনো
ধিক্কার মানি না- তুচ্ছতাকে ভাবি পাপীদের ঘেউ ঘেউ
দেশে ও বিদেশে শুধু অবিরাম সুনামের ধ্বনি-
যারা পূণ্যবান আমি পাই তাদের প্রণাম...

নব কলেবর

অমিত বাগল

আজ নক্ষত্রে চিত্রালোক। ফাগের বিভায় প্রভু নব কলেবর। তাঁর বাসন-কোসনেও আজ নক্ষত্রের
চারণ-বর্ণ। জল ফল-মিস্টো... সন্দেশ মনোহরণ বারকোসে মানুষের আসলে তো জয়, জয়ীর লেপটে
আছে, সেই সত্য শিব সুন্দর আদরের রাঙা টিপ, সম্ভাবনী যুগে যুগে... কে করবে চিরশেষ ? খালি ?
জগৎ এক বিশাল দেশ, সার্থক প্রাণ- অপাণ জুড়ে ফুটে আছে নটা-বারোটা ফুল
আমি মহানন্দের দিকে চেয়ে চেয়ে জীবনের রূপ-রস-গন্ধকেই আমার দৃষ্টি নিবেদন করি।
নিবেদন দেখি, ময়ূর-পালক বামে হেলে গেছে আর মিটি মিটি হাসছেন ফুলেশ্বর...
ফুলের ভেতর যাদুমন্ত্র, বনমালী তোর ? টিগারের বাঁশিটি বাজাই ?

মগ্ন মধুর

...ফাল্গুনী ঘোষ

দুটি শ্রমিক হাতে ধরে থাকা একটি মাতাল কাপ
টলমল করে তার শরীর, মগ্ন সে মদারু, প্রেমের
জাহাজ ভাসিয়েছে বন্দর থেকে বন্দরে, মানুষও
তাকে মাখিয়েছে প্রেমের আবির,কেউ কেউ পরিত্যক্ত
পানিয়ের বোতলের মতো ছুঁড়ে দেয় নাগরিক ডাস্টবিনে।

আহা এইতো আরো এক রং, নিজের আত্মার অতলে
ডুবে যাই টাইটানিকের মতো, ওই তো এক অনন্ত চুম্বন
জীবনের গভীর গভীর রস, বাঁচার আর্তি মাখানো আছে
ওই প্রিয়তম মাধুরীতে, প্রেমের রসে মগ্ন মদারু খাবি খেতে
খেতে জিতে নেয় একটি কবিতা লেখার সমূহ রসদ।

কবিদের এই প্রেম পরতে পরতে সেজে ওঠে কবিতার ঘর
আবার ভাঙতে ভাঙতে সে বনে যায় বিষণ্ণ ঈশ্বর।
কতোবার সে বসেছে প্রেমের গহন গাঙের ধারে
কতোবার সে হারিয়েছে এই বুকেরই শূন্য চরাচরে।

তবুওতো মধু লেগে থাকে ঠোঁটের শিশিরে,
সে চায় আরো এক মন, চায় সে ডুব দিতে বুকের সুগন্ধী গভীরে নিশির মায়ায়, রোমাঞ্চে বহমান অলীক সুন্দরে,
কেটে যায় ঘোর, কবিতার প্রহর, ভেসে ওঠে কবিতা কলম
আরো এক নূতনের ভোর।

অন্তরের নদী

কানাইলাল জানা

কথা বলতে বলতে অনেকটা পথ এগিয়ে এল অন্তরের নদী এবং দেখল গাছের ছায়ার সঙ্গে বাড়ির ছায়ার চলছে তর্কযুদ্ধ; কে বেশি মানুষের কাছের ? গাছের ছায়ার বক্তব্য বাড়ির ছায়া আশ্রয় যদি বা দেয় প্রশ্রয়ও তো দেয় যথেষ্ট কিন্তু গাছের ছায়া মানে অকপট আশ্রয় থেকে! এ যে বিশ্বাসের ওপর কষাঘাত!

'অধৈর্য্য' ও 'অপরিণামদর্শী' শব্দ দুটো আবার কুবো পাখি হয়ে ডাকছিল চাল কুমড়োর মাচায়, নদীর একান্ত ইচ্ছে এক্ষুণি খসিয়ে দিক্ তাদের ডানা। পুষ্ট হবে নক্ষত্র ছেঁচা জলে...

ওহে আধুনিক ওহে আমার স্বপ্ন বাড়ি কবিতা

সুচরিতা চক্রবর্তী

এক আধুনিক বালক রোজ আমাকে গল্প শোনাতে আসে
তার চোখে সবই আধুনিক
গল্পের ঘনঘটা, কোথায় শুরু কখন শেষ–
আমাকে মূহ্যমান করে তোলে গল্পের ক্ষয়াটে অংশ।
ক্রমশ কালের পালাবদলে সে বালক আরো আধুনিক হয়ে গল্প বলে
আমি সময়ের ঐতিহাসিক কারিগর– অণু-পরমাণুর ব্যাখ্যা দিলে অস্ত্রশস্ত্র ঝনঝন করে ওঠে
চারাপোনার গন্ধ খুঁজতে বেরিয়ে আসে মিঠে জলের কাছে।
সে আধুনিক বালক আমাকে পেন্নাম ঠোকে, ওর মুখ লুব্ধকের মতো রংবেরঙের আলোক উচ্ছ্বাসে।
ও বালক! তোমার কাঁধে ধরে রাখো সূর্যের বসন-ওই শোঁ শোঁ বাতাস- ওই শীত স্খলিত চামড়া বিলম্বিত
আস্ফালন, ইন্টারনেটের নীল আকাশ আমার হাসুহানার গন্ধ ফিরিয়ে দাও। মানুষ গল্পের জোনাকি আলো
তোমাদের শিরায় শিরায় সন্ত্রাস। পটভূমি আধুনিক চালচিত্রে ফুটে উঠেছে আক্রান্তের ছবি,
হে রোদ-বৃষ্টি-চাঁদ কিছু বলো শুনি বালির নিচে ঘর সংসার চাঁপা কান্না, কে শোনে পুরোহিতের হিং টিং ছট!
আধুনিক বালক অনেকদিন আসেনি গল্প বলেনি আমি জল বাতাসা নিয়ে অপেক্ষায় আছি স্বপ্ন বাড়ি
কবিতা লিখবো বলে।

গাছটি

আসফ আল নূর

গাছটি দাঁড়ানো কত জলকেলি, ঢেউ, খরান, পরকীর্ণ সবুজের দর্শক হয়ে। বছর বছর পরেও তার আকার-অবয়ব অভিন্নই আছে যেন। জলমর্তে ওড়া ঈগলসহ হরেক পাখপাখালির জিরিয়ে নেবার আশ্রম এই গাছ। বসন্তে কোকিলও বসে। কুহুধ্বনি-তানে অন্য আবেশে রাখে সাধক পাহাড় খানের ভিটাকে। আরশ-আবহে কী ধন্যই না ছিল এককালে এ -ভিটা! এখনও আছে, কালের পরিসরে। ঝিঁঝিঁর ডাক, আঁধার, জোনাক বা চাঁদ-তারকার পসরে অন্য এক আলোকের আলোক হতো একখন্ড রাত্রির ধ্যানযাপনের এ-ভুবন। দ্যোতিত হতো মরমের সঙ্গীতে। আঠারো শতক ডিঙিয়ে আসতেন চন্দ্রনাথ, আদুরীনাথ, মামুদ জান, লালগোঁসাই, পাগলনাথ, মানিক চান্দ। আসতেন জকির শাহ, খলিল ফকির, মনোমোহন দত্ত, দ্বিজদাস, ছফাত আলী, দীন শরৎ ও আরো অনেকে। অমূর্ত বাতাসে চড়ে, একতারের সুরে।

----- :: -----

কলিযুগ

রীতা বেরা পাল

একটু আগেই এখানে স্বপ্ন ছিল
এখন সেখানে স্বপ্নের ফসিল!
মহাকাল দেখেছে, এই পথেই পিঠে
আগুনের গোলা নিয়ে হেঁটে গেছেন যীশু।
তার হাত-পায়ের ক্ষত থেকে গড়িয়ে পড়ছিল প্রাগৈতিহাসিক রক্তের ধারা।
পোড়া মাংসের গন্ধে গাছেরা উগরে
দিয়েছিল রক্তবমি।
উপত্যাকায় পারদ নেমেছিল হিমাঙ্কের নিচে।

বোধন হলেই বেলতলায় লুকিয়ে থাকে
বিসর্জনের শোক।

তুমিই পারো এমন জলের গভীর থেকে
গভীরে মিশে যেতে।
তেলের সাথে জলের সখ্য কোনদিনই ছিল
না, তাই গর্জন তেল ফিরে আসে চরে।
তোমার হাতে লেগে থাকে ভেজা আতপের গন্ধ।
সীমন্ত জুড়ে গোধূলি বেলা, জলসিড়ি বেয়ে নেমে যাও আলতা-পরা চরণে।
কাঠামো ভেসে যায় দূরে, বহু দূরে।
মেয়েটা দু'হাতে আগলে রাখে জাগাপ্রদীপ।
জাগহাঁড়ির গর্ভগৃহে তখন শুধুই মায়া।
নিবু নিবু দীপশিখা জানিয়ে দেয় তুমি চলেছ হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরে।
সব নক্ষত্রেরা কি একদিন ছায়াপথ ধরে ?
তবে সূর্যও কি একদিন ঝুঁকে পড়বে কৃষ্ণগহ্বরের দিকে।

বিদ্রুপ

মৌমিতা মহাপাত্র

চোখে ওদের অহমিকার দীপ জ্বলছে।
ওদের কথায় রোদ ঝলমলে আকাশ নেই।
ইচ্ছে ডানার উড়ান নেই।
উপহাসের অমাবস্যায় ইতি টেনেছে কলম।
কেউ কি দেখেছো ? ওদের সীমানা কোথায় ?
কখন ওরা হাসে ? ভালোবাসে।
এক এক পল উপচে পড়ে আস্তাকুঁড়ে।
ঘেন্না কী ঘেন্না!
ওরা হুকুম দেয়...
নুইয়ে পড়ো। আরো নুইয়ে পড়ো।
তুমি জানো না খিলখিল করে হাসতে নেই।
সজীব সজীব থাকতে নেই।
আলোয় আলোয় হাঁটতে নেই।
মাটির সাথে মিশতে নেই।
প্রাণ! ভালোবাসতে

হালখাতা

শহিদ আজাদ

স্বপ্নমাখা দিনগুলো
মার্বেলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে
সীমানা পেরিয়ে গেছে বহু দূরে নিজের অজান্তে,
কৈফিয়তহীন অসময়ের কাছে হেরে গিয়ে
তাকিয়ে দেখি সময়ের ঘড়ি
শেষ ঘন্টা বাজিয়েছে দিনান্তে।

অথচ অস্থির মুহূর্তগুলো
চোখ বাঁধা দারিয়াবান্দা খেলার মতো
ঘুরপাক খাচ্ছে জীবনের চারপাশে,
সকলের চাওয়া পাওয়া মেটাতে মেটাতে
এখন শূন্যতায় ভর করে চলছি একা একা
কেউ নেই আশেপাশে।

(Diploma In Yoga & Naturopaty)
NDDY DIPLOMA COURSE
করে প্রাকৃতিক চিকিৎসা সম্বন্ধে জানুন
Affiliated By:
Mob: 9933534753
9434015356
Gandhi Smarak Prakritik Chikitsa Samity
New Delhi
Organized By: Gandhi Mission Trust
Asmission Open for any Time

আড়ালে অন্তহীন

রাখহরি পাল

জীবনের কাছে কি দাম চেয়েছো পথিক ?
পথে যেতে যেতে নিশানায় ঢিল ছোঁড়।
বন্দর ছেড়ে ফিরে গেছে যে নাবিক
তার তীরে বসে জীবনের খোঁজ করো।

দায় নিয়ে বাঁচা, বেঁচে থাকা যতদিন
খুঁটিনাটি নিয়ে সাজানো গৃহস্থালি
সুখের বাসরে ভাবনারা আলাদিন
অনিত্যের চোখে নিত্যের চোরাবালি।

যেখানে রাত্রি সেখানে উল্কা পতন
শোক শিলা ডুবতে জানে না জলে
জীবন যেখানে তার ধূপছায়া ইন্ধন
পুতুলের নাচ অভিনব কৌশলে।

তবে কি দিশাহারা তার ব্যাখ্যান
গান কেন ভাসে বাতাসে শব্দহীন
শোক তরী নিয়ে সহিষ্ণু পারাপার
তুমি থেকে যাও আড়ালে অন্তহীন।

বিষাদের রঙ

মদনমোহন দে

বিষাদের শোক, পাপ, তাপগুলি চিরন্তনী
দিঘি জ্বলে ভাসে।
তপনের ছলে রোজ কতো তপ্ত গোধূলী রঙ
ধুয়ে মুছে যায়।
বোধের সরতি দিয়ে প্রতিনিয়ত কত শত
মৃত স্বপ্নের সমীক্ষা উঠে আসে।

এই যে অনন্ত দহন, নিত্য-অনিত্যের
অনিশ্চিত মন খারাপ।
জীবনের জতুগৃহ পুড়ে পুড়ে ক্লান্ত, রুক্ষ
পরিক্রমা,
শিকড়ের টান ছুঁয়ে ছেয়ে থাকে যাপনের
চরম অভিশাপ।

তো যে হুহু ভগ্ন স্রোতে ভাসে যাপন
অমানিশা।
কত যে প্রস্থান পথ ধুসর পায়ের
ছাপ ধরে রাখে।
জল হীন শুকনো সে নদী, তৃষ্ণার্ত
পথিক হৃদয়ে বাড়ায় পিপাসা।

তরঙ্গে তরঙ্গে কত ছন্দ বাজে, ভাঙন
জড়ায় সময়ের গায়ে।
সুপ্ত অক্ষর কথা, ব্যথার পাঁজর ছেড়ে উঠে,
আসে কবিতায়।
জীবনের তরঙ্গ স্রোত ধুসর পাণ্ডুলিপি লিখে
শরশয্যা সাজায়।

মন ভালো নেহ

শশাঙ্কশেখর অধিকারী

ধ্বস্ত সময় মন ভালো নেই
শূন্য উঠোনে ম্লান একাদশী
আঁধার রাত্রি বিষাদ মলিন
অমাবস্যার গাঢ় আঁকিবুঁকি

ঝড়ের খেয়ায় প্রলয় তুফান
নদীর প্লাবন তুলছে ঢেউ
মৃত্যু নিথর পাষাণ বুকে
স্বজনহারা কাঁদছে কেউ

প্রতিবাদ মিছিল হাঁটে
মৌনমুখর ধিক্কারে
রাস্তার মোড়ে আলো নেভা বাতি
জনপদ ঢাকে আঁধারে

প্রেম ভালোবাসা এসব মিথ্যে
বন্দী জীবন অসহায়
ঝরছে পথে তাজা রক্ত
বেঁচে থাকা বিষম দায়

কলম কালিতে ফুটুক প্রতিবাদ
আর নয় খুন সন্ত্রাস
মৃত্যু পরোয়া করে না ওরা
যতই উঠুক নাভিশ্বাস

নিশুতি রাতের জমাট অশ্রু
দীর্ঘশ্বাস আধো ঘুমে
স্বপ্ন বিস্মৃতি প্রলাপমত্ত
সময় বিদ্ধ শশ্মানে

মন ভালো নেই মন
ভালো থাকে না হেথায়
আগুনখেকো মানুষ এখন
মনের মানুষ পাই কোথায়!

রাজার হুকুম

এম মহিবুর রহমান

রাজা হুকুম দিয়েছেন
এদিন সেদিন বা...

এটা বার বার নেওয়া হয়েছে
তারা বিবেক কেড়ে নিয়েছে
ওরা আমার মুখের আওয়াজ কেড়ে
নিয়েছে

রাজা হুকুম দিয়েছেন।

এবার চোখ খুলে দেখ
আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না
কেউ পারে না

রাজা আদেশ করলেন-

সময় ফুরিয়ে গেছে
ভালোভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন

রাজা হুকুম দিয়েছেন।

আমি কি বলতে পারি ?
আমি কি খাব ?
আমি কি করব ?
আমি কি মন্দিরে যাব ?
মসজিদে
অথবা গীর্জা এবং ক্যাথেড্রাল
সর্বত্র রাজার হুকুম আছে
উপরে আকাশ নেই শুধু শূন্যতা
আবার আশা হারানোর।

অনুবাদ - অসমিয়া থেকে ড. বিনয় কুমার মজুমদার

ঘরে ফেরার ডাক

সমীররঞ্জন খাঁড়া

মোহনার কাছে এলে নদী
বেগবতী হয়
পুরোনো দালানের মতো
ভেঙে যায় নদীর উঁচু-নীচু ঢেউ
পাড় মিশে যায় অনন্ত শূন্যতায়
অবকাশ নেই নদী হয়ে ওঠার
শেষ চিহ্ন নিয়ে
নদী চেয়ে দেখে ডাক এসেছে ঘরে ফেরার
সুপ্রভাত। বাগানের মরসুমি ফুল ও কবিতা;

দিলখুশ

অপর্ণা দেওঘরিয়া

কি ভাবে ঘুচিয়ে নিলে সুবিস্তৃত মন
অদ্ভুত নীল ঝড়ে অমূল্যরতন,
বদলে গেলো তোমার পৃথিবী দিলখুশ প্রেমে
কত গহীন গহনে স্বচ্ছতায় সঁপে দিলে বুক অপ্রতুল
মায়ায়...
সর্বগ্রাসী প্রেমের ক্ষুধায় নিরাসক্ত
চক্রব্যুহর কত ঢেউয়ে অনাদৃত
বাসনায় জড়িয়ে নিলে লতানো শরীর,
অদ্ভুত ভালোবাসায় কত মোহিনী ছোবলে রঙ তামসায়,
কত ঠোঁট রক্তাক্ত হোল আগুনে ফাগুনে
কত সূর্যের স্বপ্ন ডুবে গেলো চরাচরে
কত আম্রপালীর হৃদয় দ্বন্দ দোলার
কামনায়, প্রতিদিন মৃত্যু হয় টানাপোড়েন
কত মনুষ্যত্ব বিবেক স্বার্থ সুখে।

শারদ মন্থন

নবজ্যোতি পাঠক

শরতের বিশেষ অনুভূতি নেই। রাতে অবশ্য
ঠান্ডা হাওয়া আছে। তাহলে কি ভেতরে
উত্তাপ ? ঋতু পরিবর্তনের সময় সর্দি এবং
জ্বর। আমি মাটির পাত্রে বা পাত্রের মাটিতে
থার্মোমিটার রাখব।

গ্যাস বেলুনে ভাসমান কিছু রঙিন বিক্ষিপ্ত
দেশি সংলাপ। ফেনা হয়ে ওপচে যাওয়া
এক মগ বিয়ার। অথবা ম্যাসাজের জন্য
ইউনিসেক্স স্পা-এর একটি ব্যস্ত মহানগর।
অর্ধেক আসক্তি, বাস্তবতার অর্ধেক ধূসর
মাত্র। আপনার নিজের ছায়া আলিঙ্গন
করার অনেক উপায় আছে। আর
কতদিনের এই মায়া পথ ?

সহজ ধারণাগুলো জটিল হয়ে উঠছে।
কাঁচি চাঁদ এবং পূর্ণিমা একই চাঁদ নয়। ভাগ
করা রঙধনুর রঙের নিজস্ব সিল আছে।

কার নামে কোকুনগুলির মেয়াদ শেষ
হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ? তুষারপাতের নাম
কে দেবে ? আর নীল আকাশের সেই সাদা
মেঘগুলো কি একচেটিয়া নাকি সরকারি ?

যাইহোক, শরতের ঋতুতে, আমি কাউকে
জিজ্ঞাসা করতে চাই-সুগন্ধি লিলি পড়লে
কি উঠোন কেঁপে ওঠে, নাকি ডালের গন্ধে
ফুল গাছের হৃদয় কেঁপে ওঠে ?

অনুবাদ - ডা. বিনয় কুমার মজুমদার

শেষ পত্র

রাজ কৃষ্ণ সামন্ত

কল্যাণীয় পুত্র,
দুঃখীনির চিঠি মাত্র,
এর মাঝে আছে তোমার জীবন ইতিহাস।
কথা আমি দিয়াছি তোরে,
পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে,
পিতৃ পরিচয় আমি করিব প্রকাশ।
তাই আজি শুভক্ষণে,
প্রকাশিত ফল জেনে,
আশীষিয়া মনে মনে,
কলঙ্কিত কাহিনী, পত্রে প্রকাশিলাম তোমার জন্যে,
বিধবা জননীর কন্যা,
রূপে গুণে অনন্যা,
আমি জ্ঞান সঞ্চয়ে ছিলাম শিক্ষা জগতে ধন্যা।
অথবা প্রতি বাসীদের কাছে,
তখন তাই তো কত ধনীর দুলাল চোখ পেতে রয়েছে,
আমার মনটানে,
প্রেম সুধা অন্বেষনে,
ধরা দিই তাই কোটি পতির পুত্র সৌভিকের বাহু বন্ধনে,
হল জানা জানি,
পুত্র আবেদন মানি,
পিতা পন প্রথার ছুরিকা হানি,
হাজির হইল মোর বিধবা জননীর দ্বারে,
বহু টানা টানি পরে,
কথা দিল আমাদেরে,
দেড় লক্ষ টাকা বিবাহ বাসরে,
দিতে হবে করে করে
আমার সামান্য ভুলে,
পণ প্রথার বেদীমূলে,
বলি হয়ে গেল বিধবা জননী।
স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু ছিল,
একে একে সব বিক্রয় করিল,
তবু দেড় লক্ষ টাকা সঞ্চয় হয়নি।
একদিন শেষে,
খবর আশিল ভেসে,
সৌভিকের বিবাহ হয়ে গেছে গতকাল,
ভেসে আসা বার্তায়, আমার ভাঙ্গিল কপাল।
কাঁদিয়া আকুল,
"আমার এই ভুল
শোধ করিতে কত গুনিতে হইবে মাশুল ?"
ওগো স্নেহময়ী মা,
আমি কোন পথে যাব জানি না,
আমি আশাহত, হত ভাগিনী,
প্রেমের পূর্ণ্য আনন্দের অভিব্যক্তি সন্তানের জননী।
আমি কুমারী জননী,
আজ আমি কলঙ্কিনী,
পর পুরুষের অঙ্কশায়িনী।
কিন্তু আমি, স্বামী ভাবে পূজে ছিলাম তাঁর পায়,
বুঝেছিলাম-সে আমার একমাত্র আপন জন এ ধরায়।
আমার দুর্বলতার সুযোগ,
শেষে এল আমার জীবনে ঘন কালিমার দুর্যোগ।
উত্তরিন মাতা,
"হায় বিধাতা,
একি পোড়া কপাল,
ওরে সঞ্চিতা ? এই ঘন আঁধারের কি করে হবে
সকাল।"
তাঁর কান্নায়,
বুক ভেসে যায়।
কত যন্ত্রনায়,
তিলেতিলে জীবন দ্বীপ নিভে উর্দ্ধলোকে পা বাড়ায়।
এই অবস্থায় আমি বড় অসহায়,
সাহসে বাঁধিয়া বুক ঘুরিলাম হেথা হোথা খুজিয়া সহায়।
আসিলাম এই স্থানে।
আমার পরিচয় কেহ নাহি জানে।
মিথ্যা পরিচয়ে পাইলাম ঠাঁই।
শিক্ষকতার অভিপ্রায়ে আসি, ছাত্র পড়াতে পাই।
জন্ম দিলাম তোরে।
কত রাত্রির ভোরে,

আকুল হয়েছি কেঁদে কেঁদে তোমায় কোলে করে।
ছিল শুধু এই ভয়,
পুত্র কাছে তার কি দিব পিতৃ পরিচয় ?
শোন পুত্র, শুনিয়াছ কুন্তির কাহিনী,
কুমারী পৃথা ররির ঔরষে হলেন গর্ভিনী,
সতীত্বের ভয়ে, ভাষাল পুত্রকে জলে,
কিন্তু আমি তো তোমারে ত্যাগ করিনী,
মাতা জবালার পুত্র সত্যকাম,
গৌতম সকাশে হলে অধিষ্ঠান,
জিজ্ঞাসে তাহারে, তুমি কোন কুলে জাত হে ধীমান ?
মাতার নিকটে জানিয়া পিতৃ পরিচয়।
কর জোড়ে কহিল সত্য, আমি ভতৃহীনা জবালা তনয়।
মুনি সাদরে গ্রহণ করিল তারে,
তুমিও জন্মিয়াছ পুত্র সেই অধিকারে,
মৎস্যগন্ধার পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন,
অবৈধ প্রণয়ে পরাশর ঔরষে জনম।
মহাভারত রচয়িতা।
পিতৃদণ্ড নাম নারায়ণী,
ষষ্ঠবর্ষে বিবাহিতা, নবমবর্ষে বিধবা হলেন তিনি।
ষোড়ষ বর্ষে হইলেন গর্ভীনী,
জন্ম দিল দাস বৃন্দাবনে, যিনি বৈষ্ণব চূড়ামনি।
তাঁর রচিত গ্রন্থ "চৈতন্য ভাগবৎ",
বৈষ্ণব সমাজে আজ শ্রেষ্ঠ সম্পদ।।
তাদের জ্ঞানের কথা, কে না জানে এ ভারতে,
জ্ঞানের আলোকে প্রকাশিত হও পুত্র এই ধরাতে।
নন্দবংশের জারজ সন্তান,
বীরশ্রেষ্ঠ চন্দ্রগুপ্ত নাম,
তার জননী মুরা, কোন অংশে নহে খ্যাতিমান,
পেয়েছিল বীর শ্রেষ্ঠ জননীর সম্মান।
ভরতের মত, মাতারে করনা তিরস্কৃত,
মনেও করনা পুত্র তুমি আমার অবাঞ্ছিত।
আশীর্বাদ করি পুত্র, স্নেহাশীষ চুমি,
জ্ঞানের আলোকে, সমাজ কাননে প্রস্ফুটিত হও তুমি।
রাত্রি ঘনায়,
হে পুত্র বিদায়, বিদায় রজনী,
ইতি কলঙ্কিনী তোমার কুমারী জননী।

অলোকসম্ভবা

সৈয়দ হাসমত জালাল

প্রত্যুদগামিনী তোমাকে দেখেছি এক বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
শরৎপ্রকৃতি জুড়ে ছড়িয়েছ আলো, স্বর্ণপ্রভা,
কী যে ভালো লেগেছিল, অলীক বাঁশির সুর হাওয়ায় হাওয়ায়
আকাশনীলিমা অথবা তোমার বাগানের গাঢ় অপরাজিতাও
কী রহস্যময়ী, কী অলোকসম্ভবা, হৃদয় জুড়োনো দৃশ্য এ
আমাকে দিয়েছে অযুত শব্দ-পঙক্তিমালা, তারই স্রোতে যায়
আমার বিনিদ্র রাত ভেসে, শেষরাতে ম্লান চাঁদ বলে, নাও
এই নিভে যাওয়া গান, শব্দে জাগাও তাকে, যে অনন্ত অশ্রুত

আজও তাই দিন কাটে মেধার নিবিড় শ্রমে, পাথরে খোদিত করি
ওপড়ালো পাঁজরের মর্মর, তার আর্তগহন লিপি, একদিন ক্রমে
যদি তার সুর ফুটে ওঠে, শ্বেতপদ্মের মতো তনুখানি কাঁপে থরথর
শিশিরের ফোঁটা ঝরে, খেলা করে হরিণশাবক, সেই হিরণ্ময় টোড়ি
হাতে তার অলোকসামান্য বীণা, তারে তারে সুরের বিজুলিঝলক...

সে ভুবনে তুমি নেই, ভাবতে পারি না, গান কি এভাবে ফুরোবে দ্রুত

দুঃখের বৃষ্টি আমার

শান্তনু শর্মা

দুঃখের বৃষ্টি আমার শরীর ভিজিয়ে দিল
আমি কিছুক্ষণ তোমার পাশে বসব
শূন্যতা একটি অনুস্মারক হয়ে ওঠে
মরা নদীর আকাঙ্ক্ষায় ভরে উঠতে চাই

আমি কোথায় যেতে চাই ?
এই ছায়া এই মায়া অনুসরণ করে

আমি তৃষ্ণার্ত এবং ক্লান্ত
কার উঠানে থামবো ?
আমার স্বপ্নের সন্ধ্যা গোপাল কোথায়
ফুটবে ?
এই বৃষ্টির জন্য আমি মরতে পারব না
এই হল পুনর্জন্মের স্বপ্ন না দেখার দুঃখ
জীবন - অনন্ত জীবন

আকাশে মেঘ যা চায়
সাগর ও সাগর যা চায়
এক শিলা এবং শিকড় চায়
আমি সেই প্রাচীন উপলব্ধি
সমস্ত মানব নির্মাণ এবং পুনর্গঠনের
অনুভূতি

দুঃখের বৃষ্টি আমার শরীর ভিজিয়ে দিল
আমি কিছুক্ষণ তোমার পাশে বসব
দুঃখের বৃষ্টিতে কদম ফুল হয়ে ফুটবে

অনুবাদ- ড . বিনয় কুমার মজুমদার

ধারাপাত

দেবব্রত ভট্টাচার্য্য

মনে একটা দোতারা আছে
বৃষ্টি তার তারে টান দেয়
অমনি বেজে ওঠে ঘর ভোলানো সুর
মন কেমন করা অজানা কারণে উদাস হই।
যমুনার দুকুল ছাপিয়ে কান্নার বৃষ্টি
বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে বিরহ ফেরী করে।
চন্দ্রাবলী তখন রাধার গলা জড়িয়ে কাঁদে,
একজন কৃষ্ণের - অন্যে তার বাঁশীর বিরহে।

প্রকৃতি ভিজলে শীতল হয়
মন ভিজলে জ্বলে!
তখন চোখের কোন ভেজে,
কপোল ভিজে জ্বালা ধরায় বুকের মাঝখানটায়।
মাঝি বৌ ভেজা বিছানা সরায় –
ঘরের দাওয়ায় বালতি পেতে বৃষ্টি ধরে।
আমার বউ শুকনো জ্বালানি কোথায় রাখে–
সেই ভাবনায় ভিজে আঁচল মাথায়
ঘর বার ভিজতে থাকে।

হাটের দোচালায় দুহাঁটু দুহাতে জড়িয়ে ধরে
কানাই সিং ঠায় বসে থাকে
পাশে তার লাঠিটি শোয়ানো
অন্ধ চোখে সেও বৃষ্টি শোনে
অভুক্ত কানাই এখন আমারই মত উদাসী।
মন যমুনার ঢেউ বৃষ্টির প্রহর গোনে
কাব্য নয়, বৃষ্টিধারার যন্ত্রণা এখন তার সঙ্গী।

নিজের নয়, অন্যদেরও

ড. বিনয় কুমার মজুমদার

যা বলতে চাই নিজের নয়, দেশের অনেকের
সব কিছু নিজের হবার পরেও
একশো শতাংশ আপনার নিজের নয়,
অন্যদেরও।

মনে করুন রোদে ত্বক পুড়ে গেছে
বৃষ্টিতে কাদা হয়ে গেছে রাস্তাঘাট
বাতাস টিনের ছাদ উড়িয়ে দূরের মাঠে
ফেলে দিয়েছে
আমার বুকে বজ্রপাত হচ্ছে
এবং এই মত আরো অনেক জিনিস আছে
নিজের মতো লাগলেও নিজের নয়,
অন্যদেরও

বিকেলের আকাশে কখনো চাঁদ দেখা যায়
এটা বেশ একাকী মনে হতে পারে, কিন্তু
সেটা একদম নয়
দিনের আলো সূর্যের আলোকে চিনে নেয়
রাতের চাঁদ কখনো ছাড়ে না তারা

এই ধরনের জিনিসগুলো নিজেদের হবার
পরেও, কিন্তু
নিজের নয়, অন্যদেরও

ফাগুনের উষ্ণতায় মৌতাত

দিলীপ বসাক

কে স্পর্শ করে এই মন শরীর ?
মুহূর্তে ফুটে ওঠে একঝাঁক ফুল
পারুল বকুল পলাশ শিমুল।
এ ঘ্রাণের অধিকার কি শুধু মৌমাছির ?

বসন্তের বার্তা কি শুধু ঝরাপাতা ?
চির সংশ্লেষে সবুজ পাতার পুনরুজ্জীবন
কুঁড়ির যৌবন উত্তরণ তো প্রাকৃতিক আভরণ।
তবে কেন এত উদগ্রীব উন্মাদনা নিরবতা ?

নিশিথের আঁধারে কোথায় পাই সেই বাতায়ণ ?
নীলিমার জ্যোস্না কদমের সুবাস উর্মিমালা ধ্বনি
চাপা কান্নায় আজও গুমোর অপরিণত কাহিনী।
তবে কি সৌরভ ছড়াবে না চপল সমীরণ ?

শিশিরের নেশা ভুলে কেন দেখ প্রভাতের সুর্যোদয় ?
দিকচক্রবালের জহরত মেশা ফসলের ক্ষেত
অনিকেত বন্যেরা জানায় আগাম আকাঙ্খার সংকেত।
ফাগুনের উষ্ণতায় মৌতাত কি নয় এ হৃদয় ?

অভিমানের অন্তিমে

অয়ন কুমার সরকার

এই যে আমার অশ্রু ফোঁটা ফোঁটা
গড়িয়ে পড়ছে দু'চোখ থেকে গালে
বুকের ভেতর জমাট পাথর গুলো
ভাঙছে আমায় আমার অন্তরালে
এই যে আমার টুকরো টুকরো আমি
চাইছি ভীষণ রাখতে তোরই কোলে
সবার থেকে আড়ালে একা হলেই
তোরই বুকে চাইছি যেতে গলে।
কেবল,
তোরই বুকে চাইছি যেতে গলে।।

ভালবাসা

রমাপ্রসাদ মুখার্জী

লোকে আমাকে খারাপ বলে তোমাকে তো বলে ভালো
তোমাকে খুব সুন্দরী বলে আমাকে বলুক কালো,
আমি তোমারই রঙে নিজেকে রাঙ্গাতে ভালবাসি
তোমারি রূপে আমি রূপবান ভাবতে ভালবাসি।
আমাকে কালিমালিপ্ত করুক ক্ষতি নেই তাতে
তোমার শুভ্র অঙ্গে কালো বিন্দু পারবে না সহিতে,
তোমার প্রশংসা কর্ণে পশিলে পরমানন্দে হাসি
তোমারি ছন্দে দুলিয়ানন্দে আপনি সোহাগে ভাসি।
নাই হেরি ঐ অপরূপে রূপ নাই পাই ঐ স্পর্শ
ভোগ নয় ত্যাগই প্রকৃত ভালবাসার আদর্শ।
রাধা ও মীরা উভয়েই সমর্পিত কৃষ্ণ পাগলিনী
রাধা হলেন প্রেমদিবানী মীরা হলেন যোগিনী।
ভালবাসার এমন আরো রয়েছে কত কাহিনি
সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েও প্রতিদান চায়নি
ভালবাসার হৃদয় যতদিন থাকবে জগতে
ততদিনই ভালবাসা শব্দটি থাকবে ধরাতে।

"ভাদ্র নিশীথে"

রাকা ভট্টাচার্য

শ্রাবণের ধারা ফুরায়ে অধরা
এনেছে বিরহ ভাদরে।
টুপটুপ ভিজে শালিক চড়ুই
মেঘ ঢাকা কালো চাদরে।।

এমন ক্ষণেতে বিষণ্ণ রাত
বিগলিত মোম আলোতে।
মনমাঝি নাও ভিড়ায় আঁধারে
আঘাত গুনছে বাজেতে।।

শতদলগুলি নিবিড় স্বপ্নে
মগ্ন গীতিতে ভোরাই।
জল ছলছল নীরব তটিনী
মঞ্জীরে তান তোলে রাই ?

মেঘলা আকাশ মল্লার সুর
গম্ভীর ধ্বনি গরজে।
বুকে বাজে ঢাক গগনের ডাক
কে যেন চলেছে বরজে!

এমন দিনেতে কুসুম হারেতে
ফুল্লরা সাজে কামিনী।
বিষাদে হরষে রোমাঞ্চে ধীর
পোহায় ভাদ্র যামিনী।

পিয়ামুখ হেরি চকিতে দামিনী
বাসর সাজায়ে একাকী!
আঁবহু অধীর শ্যাম নীপবনে
মূরলীতে ঝড় তোলে কি ? ?

পোরফাইরিয়া

মানসজ্যোতি শর্মা

And strangled her. No pain
felt she; I am quite sure she
felt no pain.
(Porphyria's Lover/
By Robert Browning)

কে কাকে কত ভালোবাসতে পারে
কেউ কাকে কতটা ঘৃণা করতে পারে ?

গোলাপ কাঁটাকে কি জিজ্ঞেস করে ?
কাঁটা কি গোলাপ দেয়

আগুন জ্বালাবে কে ?
কে খুলবে বুকের পাটা ?

বুকের ভিতর ক্ষুধা কে জানে
প্রাণহানির শোক

পোরফাইরিয়া কিম্বা
একটা বিকেল বেলা।

অনুবাদ- ড. বিনয় কুমার মজুমদার

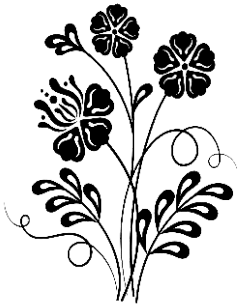

মেয়ে বেলা

শিবানী রায়

বিয়ের কদিন পর
এলাম যখন বাপের বাড়ি,
পর ই নিজের ঘর।
নিজের স্মৃতি, নিজের খেলা
নিজের মেয়েবেলা!
সব ই এখন স্মৃতি আমার
স্বপ্ন ভাঙার মেলা।
হঠাৎ করেই কেমন যেন
হয়ে গেলাম অতিথি,
বাপের বাড়ি যেতে হলে
দেখতে হবে তিথি।
নিজের বাড়ির, নিজের ঘরে
দাঁড়িয়ে যখন দেখি।
ঘরটা আমার বলে ওঠে
হারিয়ে গেছি তাকি।
আজ ও আছে ঐ বাড়িটা
যেমনি ছিল আগে, . . .
নেইকো আমার ঘর খানি আর,
পর হয়েছি যবে।
আমার পুতুল, আমার খেলা
আমার ছোট বেলা।
সব ই এখন যত্নে রাখা . . .
স্মৃতির পাতার ভেলা।
চারিদিকে ভেসে ওঠে
আমার ছুটির হাওয়া।
আর হয়না যখন তখন . . .
আমার ঘরে যাওয়া।

The Eternal Player

Rhitwick Mukherjee

A closer look at the mirror
Makes him little sad.
The whitish hair and greyish beard
Looks really really bad.

He finds it diff to look afar
With his diminishing sight.
Blurry vision makes him realise
Something's just not right.

Trembling hands make it hard
To hold the tea-cup steady
As if it is trying to say
I am no more ready.

Fading memory fades away
All the names and date,
Things keep on getting deleted,
At a slow but steady rate.

Fatigued muscles and weaker knees
Refuse to obey anymore.
Even a simple walk in park
Makes them tired and sore.

Age is finally catching up, it seems,
Making him weak and old.
"Time for you to retire and rest"
Thats what everyone told.

But...
Little did they know, he was
Still a player in his heart.
Ready forever to fight and win,
And take the table apart.

Always appearing before his match
With his fav racket in hand.
Approaching the table with honor and pride,
And take his aggressive stand.

Then as the game begins,
Slowly he forgets his pain.
Body starts to get into rhythm,
As the topspins and smashes rain

Age might have slowed his body
But spirit is still the same.
Even now, he is eager as hell,
To fight for one more game.

Win or lose doesn't matter nomore
Victory'n Defeat become same.
What matters to him the most ofcourse,
is to give his all in the game.

Cause this is the game
That gave him his identity.
And it is right here, that
He wishes to attain eternity

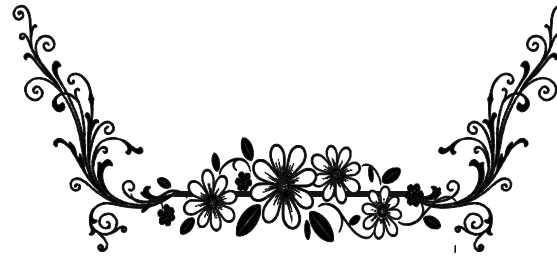

I Love Sadness

Joydev Bera (Ramdhanu)

I love sadness
Sorrow has taught me the meaning of life;
I felt the feeling of love for the first time
Sitting on the shore of the ocean of
sorrow.

I love sadness
Sadness has known me -
Like the seven colors of the rainbow.
Human colors.

I love sadness
Sadness made me realize
Sweatshop labor -
Price of a handful of rice.

Sadness is for me
A library of life;
Where I get the knowledge of reality
So, I love sadness.

স্বগতোক্তি

বিকাশ চন্দ্র

কোন সুতোয় বাঁধা আছে পাঁজর খিলান
কোথায় বা প্রথম ছোঁয়া মাটির দাগে জীবন কথা
ঘরে বাইরে আজ নীরব শ্রুতির সাড়া
চেতনার অতিক্রমে রাত দিন আমার দোসর
এভাবেই প্রত্যক্ষ বেঁচে পরম্পরা
ভুলে গেছি জন্ম মায়া ঘিরে
আত্মার নিজস্ব আলো...

কে জানে জীবন বন্ধনে কোথায় জমিআল শস্যের
অভিমান
অক্ষর বিমুখ সময়ে আগলে আছি
কলমে কবিতা অক্ষর ফুল ফুটলো জানি
সুখ দুঃখ হৃদয় এও মানুষের দান...

তাঁদেরও শ্রদ্ধা প্রণাম
আরও নান্দনিক শুভেচ্ছা অবিরাম...

যেখানে আছে এ .সি

চন্ডী খাটুয়া

গরমে আর যায় না থাকা
বলে দুটি চড়াই
এসো, গঙ্গাকলে স্নান করি
প্রাণটা এবার জুড়াই।

আমরাতা পাখি জাতি
কি-বা স্নানের দরকার
তাই তো মোদের জন্য একটিও খাট
বানায়নি সরকার।

শুনেছি গঙ্গাতে স্নান করলে
পুণ্য না-কি হয়
যতই আমরা স্নান করি আগে
কাকের নামই হয়।

তাহলে কী করবে আরো
যদি গরম পড়ে বেশি
খোলা দরজায় ঢুকে পড়বো
যেখানে আছে এসি।

বাংলা বর্ষবরণে

শ্রী সৃষ্টিধর দে

বর্ষবরণে আজি
প্রকৃতি নবরূপে সাজি
মানব অন্তরে আনন্দধারা,
চৈত্রের অবসান
বৈশাখের আহ্বান
উদ্ভিদকুলের বিকশিত চেহারা
ক্রেতা বিক্রেতার সম্পিতী
হালখাতার নিদারুন প্রীতি
হিসাব নিকাশে সমন্বয়ের সুর,
পূজা অর্চনা বিধিবৎ
নব পরিধানের জগৎ
পরিবেশ কৃষ্টিতে ভরপুর।
লেনা দেনা খারাখারি
ভেদাভেদ জ্ঞান শূণ্য করি
মওহারা মন পুলকে পলকে,
ব্যবসায়ী গণের নিষ্ঠ মন
সুষম সংহতীর প্রদীপন
ক্রেতাগণ উপস্থিত দরদিয়া পুলকে।
স্থানে সংস্কৃতি ভাবনা
নববর্ষ বরণে অদম্য প্রেরণা
আলোকে ভরুক বছর খানি,
দ্বেষ, ক্লেশ, দ্বিশি ভুলে
মানুষ দরিয়ায় অনুকূলে পাল তুলে
বর্ষবর্ণে প্রীতির ধ্বনি।
চিত্ত মাঝে আজি
বর্ষবরণে উৎকন্ঠার সাজি
বহমান হউক কৃষ্টির ধারা,
হৃদয় অন্তরের কৃষ্টির তান
প্রীতির ঘরনায় কলতান
তুষ্টিতে ভরুক বসুন্ধরা।
বৈশাখের আগমন পুলক পরশে
বিগত বৎসরের চেতনা হরষে
মানব সমাজে গড়ুক মেলবন্ধন,
উপস্থিত জন মনস্কের প্রেরণা
জাগরিত হউক সম্ভাবনা
প্রস্ফুটিত হউক আমাদের বিপ্লবী সংবাদ দর্পণ।
বিপ্লবী সংবাদ দর্পণের পাঠক পাঠিকা
পত্রিকার লেখক লেকিকা
কর্মকর্তা গণে শুভেচ্ছাদানে মতি,
যাঁরা ছেড়ে চলে গেছেন মর্তধাম থেকে
অফূরন্ত স্মৃতিটুকু এঁকে
তাঁদের আত্মার শান্তি চাই – জানাই প্রণতি।
স্বর্গীয় মঙ্গলা প্রসাদ রায়
স্বর্গীয়া অনিতা রায়
স্বর্গীয় গোপীকৃষ্ণ দাশ
কঠোর পরিশ্রমে ফসল পত্রিকাখানি
আনন্দলোকে তাঁদের ঠাঁই
পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রণতি জানাই
পাথেয় কেবল আশীর্বাদ খানি।

অপেক্ষা

তাপস দেবনাথ

দাঁড়হীন নৌকাখানি ভেসে ভেসে...
বেয়াকেল্লে ঘর বেঁধেছে অচেনা নদী স্রোতে।
এ ঘর দুই দিকে খোলা-
মিশে আছে দুর আকাশের শূন্যতায়...
দক্ষিণা বাতাসের ঝাপটা বারবার এলোমেলো করে দিলেও
এই প্রকৃতি প্রলেপ দিয়ে ভরাট করে পূর্ণতা।
কত গ্রাম - জনপদ - জঙ্গল - নদীপার
নদী পারে জেগে ওঠে, সবুজ ধানের খেত
শিকারের বাসনায় মাছ রাঙ্গার নীল চোখ...
আজও জেগে আছে;
জেগে আছে শুধু আকাঙ্খায়
চির পিপাসিত তীব্র আকাঙ্খায়!
কখন যে ঝুপ করে ছো - মেরে মাছ খাবে মাছরাঙ্গা
মাঝগাঙে পড়ে রবে বেওয়ারিশ নৌকাখানি
চারিদিক ফাঁকা; অনন্ত অন্ধকার নেমে এসে
নীল আকাশে নীলাকার হয়ে যাবে, তবুও...
সব জেনে দাঁড়হীন নৌকাখানি ভেসে চলে
কোনো এক নির্জন গায়ের অপেক্ষায়।

“অঙ্গীকার”

ডি ড্যানিয়েল

বৃষ্টিস্নাত সাঁঝের বেলায় নাতি,
দাদুর কোলে আদর খেতে খেতে
কথা কত, গল্প শত দোঁহে,
খোশ-মেজাজে দুই-জনাতে মেতে।

মজার ছলে প্রশ্ন করে দাদু,
কি হতে চাস, বড় পরে হলে
বলে নাতি, হইতো বড় আগে,
এখন মজা শুধুই তোমার কোলে।

তবে দাদু একটা কথা শোনো,
পারবোনা তো পড়ায় প্রথম হতে
মন বসেনা বইগুলোতে আদৌ,
সবই কেমন লেখা একই গতে।

ডাক্তারিতে লাগে অনেক টাকা,
ইঞ্জিনিয়ার কেমন করে বা হই
বাবা আমার মজুর খাটে রোজ,
মায়ের একটা কাপড় ভালো নেই।

কি হবে আর এমন করে সাধ,
কি লাভ বলো ভেবে এসব কথা
গরীব মোরা, দুখী মোরা কভু,
লাঘব হবে নাতো মনের ব্যাথা।

মন ছুটে যায় তাদের মাঝে সদা,
মোদের মতো গরীব যত হীন
বড় হলে, কসুর করবো আমি,
ওদের ঘরে আনতে ঈদের দিন।

শুনে দাদু এমন কথা বড়,
অনেক গুনেই নাতি যে তার গুণী
হেসে দাদু আদর মাখা গলায়,
বলে, তবে কি হতে চা’স শুনি।

অনেক ভেবে শেষে বলে হেসে,
ইচ্ছা আমার কে নম করে ক’বো
কথা দিলাম, আর কিছু না পারি,
দেখে নিও, মানুষ আমি হবো।

ষোলআনা বাঙালি

পুষ্প সাঁতরা

এসো হে তুমি নববর্ষ
আবাহনের কুসুম ডালি
কে যে সাজায় এমন করে
তুমি ই ক্ষীরচোরা বনমালি।
পুরানো বিদায় নতুন এলে
লালকালিতে আলো দাগ
ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনে
ভালবাসার অনুরাগ।
এসো বৈশাখ সুরছন্দে
কবিগুরুর গানে গানে
নব প্রভাতের কুহুতানে
রঙিন স্বপ্ন আনে।
পঞ্জিকা টা যাপন জীবন
ভাগ্যের অম্লান রেখা
বছর বুনন আচার বিচার
যোগে যোগ যাত্রা লেখা।
অনুভূতিরা কচিপাতা সবুজ
নবীনের আহ্বান
হালখাতার শুভ মহরৎ
আনন্দের সুঘ্রান
বর্ষ আসুক হর্ষ নিয়ে
দূরহোক শোক বিষাদ
মরচে পড়া বাঙালিয়ানা
শঙ্খধ্বনিতে পরম আহ্লাদ।

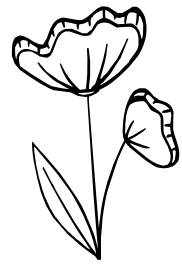

ক্রিকেটের কিং ডন ব্রাডম্যান

-বিধান চন্দ্র

স্যার ডন ব্রাডম্যান-এর খেলা আমরা না দেখলেও আজকাল-কার যুগেও অত্যন্ত সম্মানিত এবং গুণী ক্রিকেটার। তার অনবদ্য ব্যাটিং ও বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মত সহস্র শতরান এবং ৪৫২ (৪৫২) রানে নট আউট।

স্যার ডন ব্রাডম্যান ১৯০৮ সালের ২৭শে আগস্ট অস্ট্রেলিয়ার কুর্টা মুন্ড্রা শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২০ এর দশকে তরুণ ডন ব্রাডম্যান অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের বোরাল শহরে ক্রিকেট খেলা শুরু করেন। ১৯২৮ সালের ১১ই নভেম্বর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্রিসবেনে তিনি প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলেন। তিনি ৫২টি দেশে ৮০টি ইনিংশে ৬৯৯৬ রান করেন। তার সর্বোচ্চ রান ৩৩৪, সেঞ্চুরি ২৯টি। তিনি মোট ৩২ টি ক্যাচ ধরেন। তার রানের গড় ছিল ৯৯.৯৪। ব্রাডম্যান ২৪টি টেস্ট ম্যাচে অধিনায়ত্ব করেছেন। ১৫টি জিতেছেন, তিনটি ম্যাচে হেরেছেন এবং ৬টিতে ড্র-করেছেন। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ২৩৪টি ম্যাচ খেলেন। মোট ২৮,০৬৭ রান করেন। সর্বোচ্চ রান ৪৫২ নট আউট। সেঞ্চুরি ১১৭টি, গড় হলো ৯৫.১৪। ক্রিকেট নিয়ে লেখা তার দুটি বই আছে। একটি হলো 'আর্ট অব ক্রিকেট' এবং অন্যটি হলো 'ফেয়ার ওয়েল টু ক্রিকেট।'

স্যার ডন ব্রাডম্যানের বিশেষ নজর কাড়ার মত বৈশিষ্ট্য হল ৯৯.৯৪ রানের গড়। ১৯৩০ সালে ইংল্যাংেংংন্ড একদিনে তিনি ৩০৯ রান করেছিলেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি সিরিজে ৯৭৪ রানের রেকর্ড করেন তিনি। ব্রাডম্যানই একমাত্র ক্রিকেটার যাঁকে 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৯৯ সালে তিনি অস্ট্রেলিয়ার শতাব্দীর সেরা 'স্পোর্টসম্যান' খেতাব অর্জন করেন। তিনি প্রথমে বারো বছর জাতীয় নির্বাচক ছিলেন। এরপরে আবার আরও সাত বছর ঐ পদে বহাল ছিলেন।

ডন-এর বাড়ির পেছনে ছিল একটা ইটের

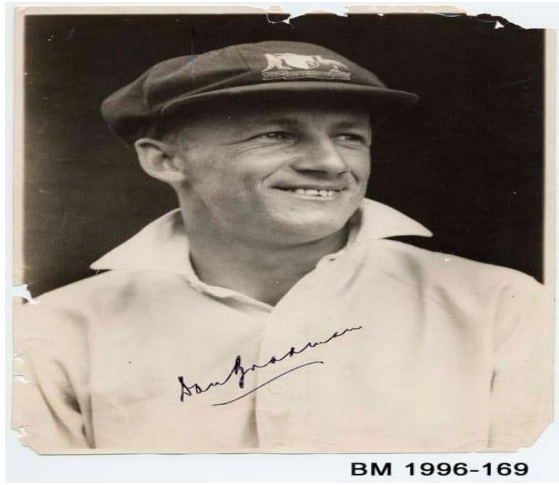

ট্যাঙ্ক। এটা ছিল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো। ব্রাডম্যান সেই দেওয়ালে বল ছুঁড়ে দিতেন। আর তার হাতে থাকত একটুকরো ব্যাটের মত কাঠ, যা দিয়ে দেওয়ালে ধাক্কা খাওয়া ফিরে আসা বলকে সজোরে বাউন্ডারি মারতেন। এই ভাবেই তিনি ভবিষ্যতের এক বিখ্যাত ব্যাটসম্যান হয়ে উঠেন। এই ভাবেই ব্রাডম্যান ফিল্ডিং অভ্যাস করতেন। গলফ বল দেওয়াল থেকে ফেরত আসার সময় তিনি ড্রাইভ দিয়ে সেই বল আটকাবার চেষ্টা করতেন। পরে ব্রাডম্যান বলেছিলেন ছোট বেলায় গলফ বল নিয়ে খেলাই তাকে তুখোর ফিল্ডারে পরিণত করেছেন।

ব্রাডম্যান ১১ বছর বয়সে প্রথম ক্রিকেট ম্যাচ খেলেন। বাওয়ালের গ্রোস পার্কে। প্রথম খেলায় তিনি ৫৫ রান করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই পার্কের নামাকরণ হয়েছিল ব্রাডম্যান ওভার নামে। প্রতিবেশী স্কুলের বিরুদ্ধে ১২ বছর বয়সে প্রথম সেঞ্চুরি করেন তিনি। ১১৫ রান করে নট আউট ছিলেন। পরের ম্যাচে তিনি করেছিলেন ৭২ রান এবং অপরাজিত ছিলেন।

বাওয়ালের ক্রিকেট টিমের অধিনায়ক ছিলেন ব্রাডম্যানের এক মামা। বাওয়ালের টিমে নিয়মিত খেলার সুযোগ ছিল না ব্রাডম্যানের। হঠাৎ কোন খেলোয়াড় অসুস্থ

হয়ে পড়লে তবেই তাকে খেলার সুযোগ দেওয়া হত। তাকে দিয়ে নিয়মিত স্কোবারের কাজ করানো হতো। এই সময় ব্রাডম্যানের বাবা অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডের পঞ্চম টেস্ট দেখতে সিডনি যাচ্ছিলেন। ডন বায়না ধরলেন, বাধ্য হয়েই তার বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। ব্রাডম্যানের দেখা সেই সিডনি মাঠ তার কাছে বড় স্বপ্ন নিয়ে এসেছিল। তিনি বাবাকে বলেছিল, দেখো একদিন আমি এই মাঠে রাজ করবো। সেদিন তার বাবা জর্জ ব্রাডম্যান তার কথা তেমন গুরুত্ব দেননি। তবে ব্রাডম্যান সেদিন সত্যই সিডনির মাঠে খেলার ডাক পেয়েছিলেন এবং তার বাবা গ্যালারিতে বসে দু'চোখ ভরে তার খেলা দেখেছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি বাওয়াল ক্রিকেট টিমের নিয়মিত সদস্য হন। তখন তিনি ডেভিস অ্যান্ড-ওয়েস্ট ক্রুল নামের একটি কোম্পানিতে

চাকরিও করতেন। উইন জেলো টিম ছিল তার পাশের শহরে। বাওয়াল ও উইনজেলোর মধ্যে ছিল ভীষণ রেষারেষি। উইনজেলো টিমে বিল ওরিলি নামে একজন তুখোর স্পিনার ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি পৃথিবীর সেরা স্পিনার হয়েছিলেন। ওরিলি সমৃদ্ধ উইনজেলোর বিরুদ্ধে ব্রাডম্যানতিনশো রান করেছিলেন। সেঞ্চুরী করলে ব্রাডম্যানের মা তাকে ব্যাট উপহার দেবেন বলেছিলেন। তিনটি সেঞ্চুরী করে ব্রাডম্যান তিনটি ব্যাট উপহার পেয়েছিলেন মার কাছ থেকে। সেই মরশুমে তিনি মোট ১৩১৮ রান করেছিলেন। সেই সময় থেকেই তিনি সিডনিতে পাকাপাকি ভাবে থাকতে শুরু করেন এবং এন সি সি দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামেন। ওই দলে তখন

ওরালি, ইয়ামন্ড, ফ্লিম্যাস, মরিস-এর মত বিখ্যাত ক্রিকেটাররা ছিলেন। ব্রাডম্যান দুই ইনিংস-এ ৮৭ এবং ১৩২ রানে অপরাজিত ছিলেন। পরের ম্যাচে এন সিসি-র বিরুদ্ধে নেমে প্রথম ইনিংস-এ ২৮ এবং পরের ইনিংস-এ ১৮ রান করেন। হঠাৎ একদিন রেডিও-র মাধ্যমে খবর পেলেন, তিনি অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন এবং তার স্বপ্ন সফল হল।

জাতীয় দলে তিনি একের পর এক ইতিহাস গড়েছেন এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন। প্রথম ব্যাটসম্যান হিসাবে দুবার টেস্টে ত্রিশতক রান করেছেন যা পরবর্তীকালে ব্রায়ান লারা, বীরেন্দ্র শেওয়াগ ও ক্রিস গেইল এই কৃতিত্বের অধিকারী হন।

তার দুরন্ত ফুটওয়ার্ক, নিখুঁত সময় জ্ঞান আর ছিল গেম সেন্স ও একাগ্রতা। এই সবকিছুর জন্যই ব্রাডম্যান চিরদিন বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে মহানায়ক হয়ে থাকবেন। অস্ট্রেলিয়া আজও ব্রাডম্যানের স্বপ্ন বয়ে নিয়ে চলেছেন এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

২০০১ সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী এই মহান ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেট শহরে মারা যান কোটি কোটি খেলা প্রেমিকদের শ্রদ্ধা আর অকুণ্ঠ ভালবাসা নিয়ে।

WITH BEST COMPLIMENTS FROM:-

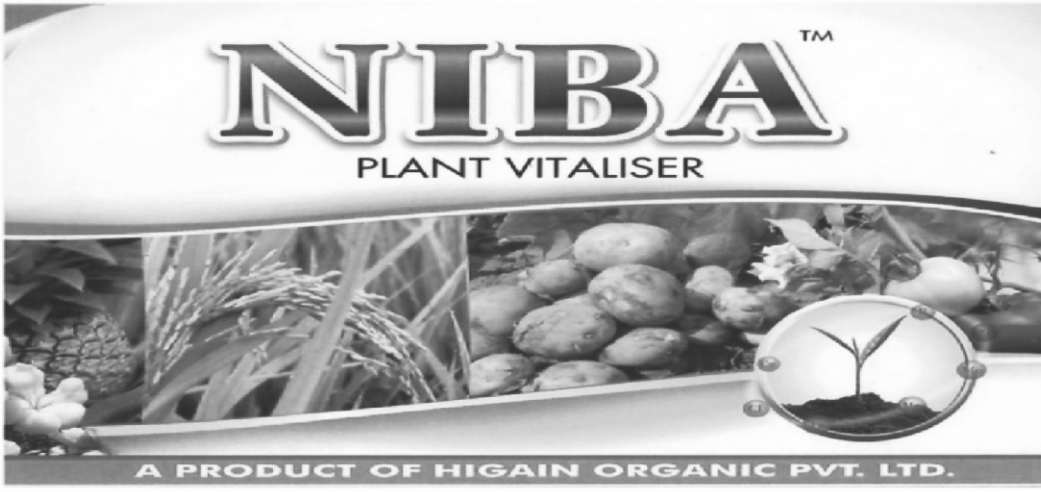

HIGAIN ORGANIC PVT. LTD
KOLKATA
Contact Detail : 7001310508

শুভ নববর্ষ - ১৪৩১
With best compliments from:
9735579059
9083251638

RAJ ENTERPRISE

Deuli (Sarishamore), Belda,
Paschim Medinipur, Pin-721424

Email: enterprise.raj18@gmail.com

Computer, CCTV, AC, Smart TV, Refregerator, Inverter
Electronics Solution & Govt. General Order Supplier

HELP LINE NO.
7076782183
DOUBLE COOL
খাও
গরম ভুলে যাও
Healthy Milk with Delicious Cream
DOUBLE COOL
AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY
ICE CREAM
fssai
A Product Of Siromoni Food Products Pvt. Ltd.

Affiliated with- Government of West Bengal, (Transport Dept.)
HAZRA
MOTOR DRIVING TRAINNING SCHOOL
Office Address
Head office - 70, East Avenue, Bidhannagar, Midnapore.
Corporate Office - Church Road, Sekhpura, Midnapore. (Near Tripaul Traders.)
MOB - 8759119982

Keranitola Medinipur
6295086599
100% HALAL CERTIFIED
HALAL
মেদিনীপুরে বিরিয়ানি মানে
দাদা বৌদি বিরিয়ানি
অসাধারণ স্বাদ
অতুলনীয় সুগন্ধ
যা মন ভরিয়ে দেয়

UAL BENGAL
A unit of UAL Industries Limited

Our achievements :-

ICC Environment Award

ICC Social Impact Award

CII Encon Award

Clean & Green Industry Award

Water Warrior Award

Sanmarg Business Award

Our Brand & Products:-

Fiber Cement sheet

KONARK

Right at the top

Fiber Cement sheet

About Us :-

__UAL INDUSTRIES LIMITED__ is the market leader as largest producer of finest quality Fibre cement Sheets and Roofing Accessories in Eastern India. The Superior Quality is maintained through implementation of Integrated Management Systems (ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001) adopted by UAL-BENGAL.

__UAL – BENGAL__, a unit of UAL Industries Limited, set up in a small tribal village Tungadhowa in Jhargram District of West Bengal, has adopted clean development mechanism through Zero Waste and Zero Effluent Management, and also developed a natural forest cover all around to create a pollution free & healthy environment. The Company stands committed for social & sustainable development of the community for all times to come.

Our Activities:-

Ambulance Service for nearby Villages

Construction of Waiting Lounge at Bhangagarh Rural Hospital

Ration Distribution

School donated by UAL-BENGAL

Works:-
UAL BENGAL
A unit of UAL Industries Limited
P.O: Mahim Nischinta, Dist:Jhargram,W.B-721513

Corporate office:-
KONARK
Mani Uday;16 Mayfair Road,Kolkata-700019,
Telephone- 2283 8801 -05 E-Mail: ual_kol@ualind.com

₹ 90.00

BIPLABI SAMBAD DARPAN
A Prominent Bengali Media Organization
Digital and Print Media and Book Publication
https://biplabisambaddarpan.com

বিপ্লবী সংবাদ দর্পণ

ISBN 979-8-9988-0642-1

9 798998 806421 >